পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারি-২০০৭- ডিসেম্বর ২০০৮

জমির মূল্য ঃ ব্যক্ত অব্যক্ত ও উদ্বৃত্ত

উন্নয়নের অন্য দিশা

ওষুধ ডাক্তার ও দুর্নীতি

পশ্চিমবঙ্গে ফ্লোরাইড বিপদ

পুরনো শক্তি নতুন শক্তি

ন্যানো নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর

চিনে ভেজাল

আর টি আই হালচাল

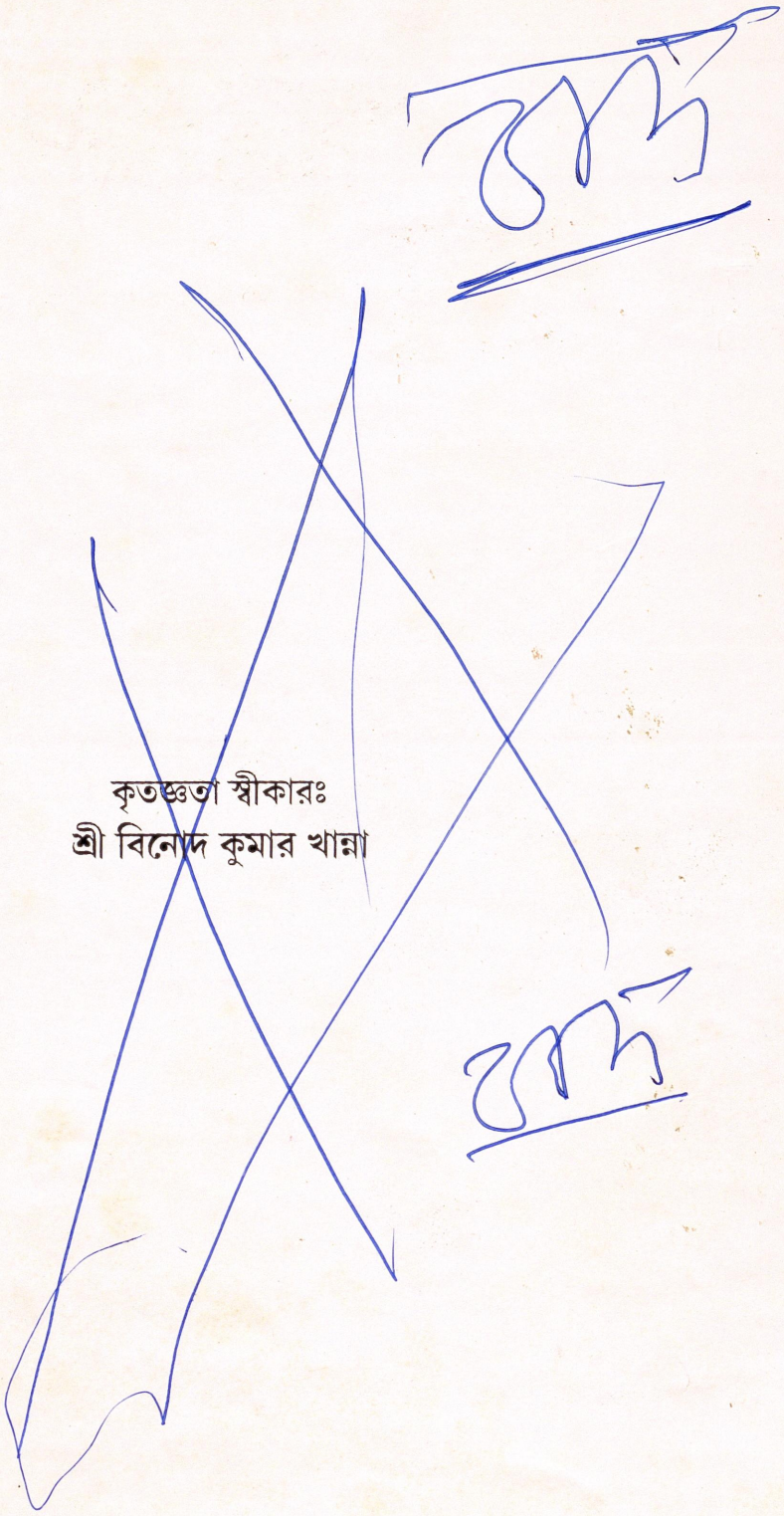

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
শ্রী বিনোদ কুমার খান্না

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ ৩০ সংখ্যা ১-৮ □ জানুয়ারি- ২০০৭-ডিসেম্বর-২০০৮

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
বর্ষ ৩০ সংখ্যা ১-৮
জানুয়ারি-২০০৭-ডিসেম্বর ২০০৮
□
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
পি ২৫২ লেক টাউন, ব্লক এ
কলকাতা ৭০০ ০৮৯
□
মূল্য কুড়ি টাকা
□
Vigyan O Vigyankarmi
Rn. No. 34929/79
□
Vol. XXVIII No. 1-8
January 2007-December 2008
□
Communication :
C/O Avijit Lahiri
P252 Lake Town, Block A
Kolkata 700 089
□
e-mail :
bob_swf@yahoo.co.in
web site: www.geocities.com/bob_swf/

সূচীপত্র

আমাদের কথা		৫
জমির মূল্য ঃ ব্যক্ত অব্যক্ত ও উদ্বৃত্ত	রবীন মজুমদার	৬
রোজগারহীনদের জন্য কাজের ব্যবস্থাই হোক উন্নয়নের আপাতত লক্ষ্য	রবীন চক্রবর্ত্তী	১১
আমাদের ঐতিহ্যে পরিবেশ	সুভাষ গাঙ্গুলী	২১
নতুন শক্তি : নতুন সমাজ ?	শুভব্রত নিয়োগী	২৪
ভারতের পারমানবিক উদ্যোগ - ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০	প্রদীপ দত্ত	২৭
ফ্লোরাইড বিষক্রিয়ার তাণ্ডব এখন পশ্চিমবঙ্গেও	মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার	৩৩
ওষুধ, ওষুধের দাম, চিকিৎসা ও অসুখীমানুষ	উত্তান বন্দোপাধ্যায়	৪১
স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার ?	প্রদীপ সাহা	৪৭
তথ্য জানার অধিকার আইন কোথায় দাঁড়িয়ে এখন	রবীন চক্রবর্ত্তী	৪৯
বিজ্ঞানে না বিশ্বাসে ! প্রশ্ন তুলেছেন পদার্থবিদ পল ডেভিস	নিখিলেশ পাল	৫৩
প রি ক্র মা		৫৬
ডাঃ বিনায়ক সেন	শ্যামলী খাস্তগীর	৬৭
অশোকদাকে প্রনাম করা হয়নি	প্রদীপ দত্ত	৬৯

আমাদের কথা

দীর্ঘ দুবছরের ব্যবধানে আবার বেরুলো বিওবি। ঘটনাবহুল তাৎপর্যপূর্ণ দুটো বছর। আমরা ঠিকই করেছিলাম, কসরৎ করে বিওবি বার করার চেষ্টা করবো না। বলার কথা যদি থাকে, যদি তাগিদ আসে ভেতর থেকে, যদি অন্তত কয়েকজনও হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা সত্যিকারের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব নিতে পারি, যদি লেখাপত্রের জন্য প্রচুর কাঠখড় না পোড়াতে হয় তাহলে বিওবি স্বাগতম। এবং কী আশ্চর্য, এবার ঠিক যেন তেমনটাই সব ঘটে গেল। বোঝা যাচ্ছে সময় পাল্টাচ্ছে।

আগের বার বিওবি'র 'আমাদের কথায়' নন্দীগ্রামের মানুষদের ঋজু ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার তেজ, সাহস, দৃঢ়তা প্রত্যয়ের আগাম ইঙ্গিতটুকু শুধু দেওয়া গেছিল, সে ছিল ২০০৭ এর জানুয়ারীর গোড়ার দিক। তারপর জল অনেক দূর গড়িয়েছে। রাজ্যবাসী সে সব প্রত্যক্ষ করেছেন। অনেক ত্যাগ যন্ত্রণা মৃত্যুর মধ্যদিয়ে নন্দীগ্রাম তাদের প্রতিবাদের আগুনের আঁচ পৌঁছে দিয়েছে এ রাজ্যের জেলায় জেলায় তো বটেই এমনকি গোটা ভারতে এবং দুনিয়ার তামাম সন্ত্রস্ত মানুষদের কাছে। সময় সত্যি দাঁড়িয়ে নেই।

বিশ্বায়নের রথের চাকা আর্থিক সংকটের গাড্ডায় পড়ে হাঁসফাঁস করছে, মন্দার আঁচ পেয়ে টাটারা সিঙ্গুর ছেড়ে পালিয়েছে। মুখ রক্ষার জন্য অবশ্য দোষ চাপিয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরোধিতার ওপর। বারাক হুসেন ওবামার 'এসো পরিবর্তন করি' ডাকে সাড়া দিয়ে দাম্ভিক মিথ্যাবাদী যুদ্ধবাজ বুশকে নির্বাচন বৈতরণীতে ডুবিয়ে ছেড়েছে আমেরিকার মানুষ, ঘরের পাশের বাংলাদেশও পরিবর্তনের জোয়ারে পাল তুলেছে। চিরকালের শান্ত, বোবা, পড়ে পড়ে মার খাওয়া আনপড়ও আজ মুখটি বুজে অত্যাচার মেনে নিচ্ছে না। জেগে উঠেছে লালগড়, চতুর্দিকে লালগড়ের ছায়া দেখে আঁতকে ওঠে অত্যাচারীর দল। নামিয়ে আনতে চায় আরও অত্যাচার, কোথাও কোথাও আনেও। পরিবর্তনের এই চলচ্চিত্রে দেখা যায় একদিন যারা ছিল বঞ্চিত-নিপীড়িত-অত্যাচারিতের সাথে, ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি - তাদেরই কেউ কেউ আজ অত্যাচারীর দলে। মুখে পুরনো প্রতিবাদ - প্রতিরোধের বুলি। গায়ে শান্তির নামাবলী, প্রশ্ন সমালোচনা সামান্যতম প্রতিবাদের আভাষ পেলেই তাদের লুকনো নখ-দন্ত-অস্ত্র বেরিয়ে আসে, মানুষকে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিসর ছাড়তে চায় না, অথচ গণতন্ত্রের জয়গানে সর্বদা সে মুখর। এরাই আবার আড়াল খোঁজে সন্ত্রাসের। সন্ত্রাসের ছুতোয় আট-ঘাট বেঁধে গড়ে তোলে আরও কঠোর সন্ত্রাসের পরিকল্পনা।

আসলে এ সবই পুরনো লড়াই-এর নতুন রূপ। নতুন এবং ভয়ংকর - কেননা এ হল পৃথিবীর মৌলিক রসদের ভোগদখলের লড়াই। পরিবেশ সম্পদের কর্তৃত্বের, নিয়ন্ত্রণের লড়াই। আগামী দিন তাই আশার এবং আশঙ্কারও, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের এবং সন্ত্রাসেরও। পরিবর্তনই সেখানে আশার বীজ, পরিবর্তন হতে থাকলে ক্রমশ তা শুভের দিকে, সার্বিক উন্নয়নের দিকেই গড়াবে এমনটা এখন বোধহয় ভাবাই যায়।

দেড়-দুদশক ধরে জমে উঠছিল কেমন যেন একটা গুমোট দম-বন্ধ করা পরিবেশ। হতাশা, আর একঘেয়েমি বিষণ্ণ করে তুলছিল মনের আকাশ, এক এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আলো হাওয়া খেলার ঘুলঘুলিগুলো। সেখানে লেগেছে হঠাৎ ঢুকে আসা বাতাসের আন্দোলন, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখে জেগেছে কাঁপন। এ বাতাস ছড়িয়ে পড়ুক দিগ্বিদিকে, অক্সিজেনে প্রাণভরে শ্বাস নিক হেঁপো রুগীর দল; এ আলো ব্যাপ্ত হোক বিশ্বচরাচরে, উদ্বোধন হোক উন্নয়নের উৎসবের।

ঘন অন্ধকারে নিভু নিভু একটি প্রদীপ জ্বেলে রাখার চেষ্টার মধ্য দিয়েও যারা আশায় দিন গুণে গুণে দিন যাপনের গ্লানিকে জীবন যাপনের গরিমায় রূপান্তরিত করা চেষ্টা করে চলতে পারে, ডাক দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তারই মত অন্যদের তেমনই এক সহমর্মী সহযাত্রী বন্ধু অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকালে হারালাম আমরা। গভীর শোক, শ্রদ্ধা ও মর্মবেদনার সাথে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি।

জমির মূল্য ঃ ব্যক্ত অব্যক্ত ও উদ্বৃত্ত

রবীন মজুমদার

মার্ক্সবাদের অন্যতম তাত্বিক ভিত্তি হল শ্রমের উদ্বৃত্তমূল্য। এর মোদ্দা কথাটি প্রায় সবাই জানেন — শিল্পপতি/পুঁজিপতি শ্রমিকদের শুধুমাত্র কোনমতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যটুকুই ফেরৎ দেন। অথচ শ্রমসৃস্ট মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি। শ্রমের এই উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করেই জমে ওঠে মূলধন, সেই মূলধন বিনিয়োগ করে তৈরী হয় আরও উদ্বৃত্তমূল্য, আরও মূলধন, আরও বিনিয়োগ। শিল্পের উৎপাদন বাড়ে, আয় বাড়ে। বাড়ে জাতীয় আয়ও, কিন্তু শ্রমিকের অবস্থার মৌলিক উন্নতি হয় না। শিল্পোৎপাদনে অবশ্য শ্রম ছাড়াও দরকার হয় আরও দুটি উপাদানের - পুঁজি ও জমি।

অন্যান্য জমিকে শিল্পের জমিতে পরিণত করতে গেলে জমির সূত্রেই যে একটি উদ্বৃত্তমূল্যের উদ্ভব হয় সেটা বোঝার ও মেনে নেবার সময় এসে গেছে। কৃষির তুলনায় শিল্পে আয় বেশী হবার রহস্য লুকিয়ে আছে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিরাট মূলধনকে শিল্পে আত্মসাৎ করার মধ্যে, এবং ইকোসিস্টেম তথা পরিবেশ পরিষেবাগুলোকে বেমালুম গায়েব করে ফেলার মধ্যে।

এই তত্বকে হাতিয়ার করেই বিশ্বজুড়ে মার্কস অনুগামীরা শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন ও লড়াইতে সামিল হন। এক সময় জোরালো সওয়াল উঠেছিল যে শিল্পোৎপাদনের উপাদান তিনটি নয় চারটি। শ্রম, জমি মূলধন ছাড়াও শিল্পোদ্যোগও (Enterpreneurship) একটি অপরিহার্য উপাদান। সে প্রশ্নের কোন সুষ্ঠু মীমাংসা হয় নি।

শ্রম এবং জমির মূল্যায়ণ প্রসঙ্গেও মার্কসবাদ তেমন আলোকপাত করতে পারেনি। শিল্প উৎপাদনে জমি কি কোনোভাবে কোন উদ্বৃত্তমূল্য যোগ করতে পারে? যদি করে, তবে কে বা কারা তা ভোগ করে? এসব প্রশ্নের সদুত্তরের হদিস তখনই পাওয়া সম্ভব যখন গ্রহণযোগ্য কোনো পন্থা-পদ্ধতিতে জমির প্রকৃত ও পরিমাণগত মূল্যায়ণ করা যাবে। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত বাস্তুবিজ্ঞান (ইকোলজি) এবং পরিবেশ অর্থনীতি (এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিক্স) - এ ব্যাপারে নিস্পত্তির পথে অনেকটাই এগিয়েছে। বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞরা জমির মূল্যায়ণ-পন্থার হদিস দিচ্ছেন, যার সাহায্যে বোঝা যাচ্ছে যে জমিরও উদ্বৃত্তমূল্য সম্ভব। এবং শ্রমের মতই জমির উদ্বৃত্তমূল্যও আত্মসাৎ করেন প্রধানত শিল্পপতিরাই (যদি জমি শিল্পে ব্যবহৃত হয়) = বঞ্চিত হয় পুরনো জমি-ব্যবহারকারীরা, বঞ্চিত হয় সমাজ এবং পরিবেশ।

বস্তুতঃ শুধু জমি নয়, আজকের দিনের বিজ্ঞানের আলোকে জল, বাতাস এবং জীববৈচিত্র্যকেও (Water, Air and Biodiversity) এই আলোচনায় আনা উচিত। কারণ শিল্প-উৎপাদনে এগুলিও প্রয়োজন। এগুলিকেও শিল্প উৎপাদনের উপাদান বলে গণ্য করা যায়। শিল্প উৎপাদনের উপাদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে তার একটি বাজার (দর) থাকে। জল এবং জীববৈচিত্র্যের (অর্থাৎ জৈবদ্রব্যাদি - উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত, শিল্পের কাঁচামাল) যে বাজার আছে তা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। কার্বন-বাণিজ্যের মোড়কে এখন বাতাস তথা বায়ুমন্ডলও বাজারী লেন-দেনে ঢুকে পড়েছে। ক্ষমতা ও অর্থবান দেশরা এখন প্রতি টন কার্বন ড্রাই-অক্সাইড বাতাসে ছাড়ার জন্য নির্দিষ্ট হারে দাম দিচ্ছে অথবা প্রতি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে না ছাড়ার জন্য নির্দিষ্ট হারে মূল্য উশুল করতে পারছে। অর্থাৎ বাতাস তথা আকাশও বাজারভুক্ত এবং শিল্প-উৎপাদনের উপাদান তথা হাতিয়ার।

জমির প্রকৃত মূল্য ঃ নতুন দিগন্ত

এ নিবন্ধে আমরা শুধু জমিতেই থাকতে চাই। এবং দেখতে চাই যে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক তত্ব - তথ্যের নিরিখে, জমির মূল্যায়ণ কিভাবে করা যায়, জমির উদ্বৃত্তমূল্য থাকতে পারে

কিনা বা থাকলে তা কোথায় যায়।

জমি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ছিল যে তা এক ভূখন্ড মাত্র যেখানে ফসল ফলানো যায় বা বাড়ীঘর কল-কারখানা তৈরী করা যায়। উনিশ শতকের শেষদিকে জমিকে এভাবেই দেখা হতো এবং ১৮৯৪ সালে প্রণীত ভারতের জমি অধিগ্রহণ আইন এরকম ধারণাকে আত্মস্থ করেই তৈরী হয়েছিল - এমনটা ভাবা অসঙ্গত হবে না। কিন্তু আজও এই আইন অসংশোধিতভাবে প্রয়োগ করলে তা হবে ভয়ঙ্কর কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট, শুধু একারণেই নয় যে উপনিবেশ-শাসক ইংরেজরা এই আইন প্রণয়ণ করেছিল একশো বছরেও বেশী আগে, বরং আরও এই কারণে যে এই সময়ের মধ্যে, বিশেষ করে বিগত কয়েক দশকে পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাস্তুবিজ্ঞান ভৌম এবং অন্যান্য বাস্তুসংস্থানের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অনেক ঘনিষ্ঠ তথ্যাদি উপস্থাপিত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখন অনেক গভীর ও বাস্তবনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পরিবেশ এবং বাস্তুসংস্থান (ইকোসিস্টেম) সম্পর্কিত অর্থনীতিও চর্চার একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা নিরন্তর প্রয়াস পাচ্ছেন ''ইকোসিস্টেম পরিষেবা ও প্রাকৃতিক মূলধনের'' হিসাব নিকাশ করার। ''ইকোসিস্টেম পরিষেবা ও প্রাকৃতিক মূলধন'' কথাটা নেওয়া হয়েছে কস্টাঞ্জা এবং আরও ১২ জনের লিখিত একটি গবেষণাপত্র থেকে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছিল বিখ্যাত 'নেচার' প্রত্রিকায়, ১৯৯৭ সালে [The value of the World's Ecosytem Services and Natural Capital - R. Costanza and others, Nature, Vol. 387, p.253, 1997]। এই গবেষণাপত্রে লেখকরা প্রাকৃতিক ১৩ প্রকার ইকোসিস্টেম (যেমন সামুদ্রিক, উপকূলীয়, আরণ্যক, চারণভূমি ইত্যাদি ইকোসিস্টেম) এবং সেগুলির ১৭ প্রকার পরিষেবাকে চিহ্নিত ও মূল্যায়ণ করেছেন। ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন শতাধিক প্রকাশিত গবেষণাপত্র এবং নিজেদের সংগৃহীত কিছু তথ্যকে। চমকে দেবার মতই ফল বেরিয়ে এল - সমগ্র পৃথিবীর সব ধরণের ইকোসিস্টেমগুলির মোট বার্ষিক পরিষেবার (উৎপাদন সহ) মূল্য যেখানে দাঁড়ালো ৩৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলার (১ ট্রিলিয়ন = $১০^{১২}$ অর্থাৎ ১লক্ষ কোটি) যেখানে ঐসময়েই পৃথিবীর ১৯৪ টি দেশের বার্ষিক মোট উৎপাদন (GDP) হল প্রায় তার অর্ধেক। মাত্র ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার! গবেষণাপত্রটিতে আরও প্রকাশ পেল যে প্রায় প্রতিটি ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রেই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, সামগ্রিক মূল্যের ভগ্নাংশ মাত্র। শস্যক্ষেত্র ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে, গবেষকরা দেখালেন, ১৭ টির মধ্যে ১৫ টি পরিষেবা ক্রিয়াশীল, কিন্তু সেসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ঘাটতি আছে। এর পরে এই বিষয় নিয়ে অনেক দেশেই জোরদার গবেষণা শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাদা জার্নালও প্রকাশ হতে থাকে। ২০০৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে সারা পৃথিবীর ১৩০০ বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণে প্রকাশিত হয় 'দ্য মিলেনিয়াম ইকোসিস্টেম অ্যাসেসমেন্টক্স (The Millennium Ecosystem Assessment) রিপোর্ট। এতে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন মহাদেশের কোণে কোণে ঘটে চলা বহু বহু উদাহরণ - কিভাবে প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম পরিষেবাগুলি মানুষের অবহেলা, উপেক্ষা, উন্নয়নের অত্যাচারের শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, আর সেসব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মানুষই, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষরা। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর পরই লন্ডনে জড়ো হয়েছিলেন প্রখ্যাত একদল পরিবেশ অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ। দুদিনের পর্যালোচনা শেষে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যার পার্থ দাশগুপ্ত অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলেন -- জাতীয় লাভ ক্ষতির হিসেবের খাতায় প্রাকৃতিক উৎপাদন ও পরিষেবাকে স্থান দিলে তবেই দারিদ্র-কে ইতিহাসে পরিণত করা যাবে। ভারতীয় উপমহাদেশের উদাহরণ তুলে তিনি বলেন ১৯৭০- এর দশক থেকেই এই অঞ্চল মোট জাতীয় উৎপাদনের (GDP) নিরিখে ক্রমাগত ধনী হয়ে উঠছে, কিন্তু বাস্তবে মাথাপিছু সম্পদের (Wealth) পরিমাণ কমেই চলেছে, কারণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক মূলধন (Natural Capital) তছনছ করা হচ্ছে।

বিশেষ বিশেষ ইকোসিস্টেমের মূল্যায়ণ প্রয়াস যদিও চলছে এবং বিস্তৃতও হচ্ছে, শস্যক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা এখনও যথেষ্ট নয়। শস্যক্ষেত্রও আবার একরকমের নয়। শস্য-উৎপাদন হয় এমন যে কোন ভূক্ষেত্রই শস্যক্ষেত্র। কিন্তু এদের

কোনটি যদি হয় পুরোপুরি প্রাকৃতিক, অধিকাংশই আধা বা আংশিক প্রাকৃতিক, যেখানে বিভিন্ন প্রকরণে ও মাত্রায় মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটে। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে যতটুকু জানা যায়, প্রায় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক শস্যক্ষেত্রে খাদ্য (ফসল) উৎপাদন, সামগ্রিক মূল্যের মাত্র এক শতাংশ মত। কিন্তু মানুষ যেখানে প্রচুর পরিমাণ বাড়তি শক্তি যোগান দেয় (বীজ, সার, সেচ, কর্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে) সেখানে শস্য উৎপাদন ৩০ শতাংশেরও বেশী হতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায় মানুষের সাহায্য এইসব শস্যক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিষেবার স্থান গ্রহণ করে বা একটির পরিবর্তে অন্য পরিষেবা বাড়াতে মদৎ যোগায় এবং মোট মূল্যের নিরিখে উৎপাদনের অংশ বেড়ে যায়।

বিষয়টিকে সহজ করে বোঝবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রণীত ও প্রকাশিত নবম শ্রেণীর চালু পাঠ্যপুস্তক ''পরিবেশ পরিচয়ের'' শরণ নিতে পারি। এতে (পৃঃ ২৭-২৮) ৫০ বছরের পরিণত একটি বৃক্ষের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, কাঠের মূল্যেই গাছটি হয়তো বাজারে বিকোয়, কিন্তু পরিবেশের মধ্যে থাকা অবস্থায় ঐ গাছটি ইকোসিস্টেমের অঙ্গ হিসেবে যে পরিষেবা ও দ্রব্যাদি দেয় তার মূল্য বাজারে কোন স্বীকৃতিই পায় না। অথচ কাঠের মূল্য সামগ্রিক মূল্যের এক শতাংশেরও কম, মাত্র ০.৮ শতাংশ। অবশিষ্ট ৯৯.২ শতাংশ মূল্যের উৎস হল বৃক্ষটির প্রাকৃতিক (ইকোসিস্টেম) পরিষেবা, যার মধ্যে ধরতে হবে মৃত্তিকা গঠন ও ক্ষয়রোধ, জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসের বায়ুমন্ডলীয় ভারসাম্য বজায় রাখা, পৌষ্টিক উপাদানগুলির পুনশ্চক্রায়ন (Recycling), পরাগসঞ্চার, নান্দনিক সৌন্দর্য বিধান ইত্যাদি। গাছটি বেচে হয়তো পাওয়া যাবে মাত্রই ১০,০০০ টাকা, কিন্তু এই পরিষেবাগুলির জন্য গাছটির মূল্য হওয়া উচিত পনের লক্ষ টাকা, কেননা এই পরিমাণ টাকাই খরচ করতে হবে, গাছের দেওয়া পরিষেবাগুলি পেতে। ডঃ তারকমোহন দাস ১৯৮০ সালে এরকম একটি মূল্যায়ণ প্রথম তুলে ধরেছিলেন, অনেকের হয়তো মনে পড়বে।

বাজারদর বনাম ক্ষতিপূরণ

বৃক্ষের মতো জমিও নানারকম পরিবেশ পরিষেবা দেয়, অথচ বাজারে জমির মূল্যে তার স্বীকৃতি নেই। বৃক্ষের মতই জমিরও প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা যায়। সিঙ্গুরের যে জমিকে রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে টাটাদের লিজ দিয়েছিলেন, সেটাকে একটা উদাহরণ হিসেবে নিয়ে আমরা ঐ জমির মূল্যায়ণের প্রয়াস পেতে পারি। এখন তো সবাই আমরা জানি যে সিঙ্গুরের জমির জন্য কৃষকদের একর প্রতি ৮-১২ লক্ষ টাকা ''ক্ষতিপূরণ'' দেওয়া হয়েছিল এবং আইনী নির্দেশ মোতাবেক ''ক্ষতিপূরণের'' এই অঙ্ক জমির বাজার দরের ভিত্তিতেই স্থিরিকৃত হয়েছিল বলে সরকারের দাবী। হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা এই ক্ষতিপূরণটাকে একর প্রতি ১০ লক্ষ টাকা ধরে নিতে পারি।

এখন, কৃষিজমির বাজার দরের সঙ্গে জমিতে উৎপাদিত ফল-ফসলের বাজার দরের সরাসরি সম্পর্কও অবশ্যই আছে। কৃষিজমি শস্যক্ষেত্র (Cropland) ইকোসিস্টেম। সিঙ্গুরের কৃষিজমি পুরোপুরি প্রাকৃতিক নয়। আবার তা অতি- উন্নত আধুনিক শিল্প-কৃষিরও নিদর্শন নয়। বাইরের শক্তি জোগান কিছুটা হয় ঠিকই। কাজেই এই ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে ধরা যায় উৎপাদিত ফসলের বাজার মূল্য সামগ্রিক মূল্যের এক শতাংশের বেশী। কিন্তু ৩০ শতাংশের কম। প্রকৃত তথ্য যেহেতু নেই, খানিকটা অনুমান করতেই হবে। বিভিন্ন দেশে যেসব শস্যক্ষেত্র ইকোসিস্টেমের সামগ্রিক মূল্যায়ণ করা হয়েছে এবং গবেষণাপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, সেসবের নিরিখে বলা যায়, সিঙ্গুরের ঐ জমির উৎপাদিত ফসলের বাজারমূল্য বড়জোর সামগ্রিক মূল্যের ৫ শতাংশ হতে পারে। অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি, সিঙ্গুরের জমির একর প্রতি বার্ষিক প্রকৃত সামগ্রিক মূল্যের ৫ শতাংশের মান ১০ লক্ষ টাকা, অতএব সামগ্রিক বার্ষিক মূল্য হবে ২০০ লক্ষ বা ২ কোটি টাকা, একর প্রতি। এর ১৯৫ লক্ষ টাকাই অদৃশ্য মূল্য যা ইকোসিস্টেম পরিষেবাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর যেহতু মোট ৬৪৫.৬৭ একর জমি শিল্পের জন্য ৯০ বছরের লিজ চুক্তিতে টাটারা পেয়েছিলনে অতএব ধরা যায় ঐ জমি অন্তত ৯০ বছর কোন ইকোসিস্টেম পরিষেবা দেবে না। তাই শিল্পের জন্য দেওয়া ঐ জমির সমগ্র মূল্য দাঁড়ায় ২X৯০X৬৪৫.৬৭ কোটি টাকা বা ১১৬২২০ কোটি

টাকা। এখানে ১০ লক্ষ টাকাকে একর প্রতি বার্ষিক মূল্য ধরাটা যুক্তিযুক্ত কেননা, নীতিগতভাবে, অন্তত ঐ (বাজার) মূল্যেই প্রতি বছর জমি এক কৃষক থেকে অন্য কৃষকে হস্তান্তরিত হতে পারতো।

এটা বলা ঠিক হবে না যে টাটাদের কাছে শিল্পের জন্য হস্তান্তরিত ঐ জমির মূল্য হওয়া উচিত ১১৬২২০ কোটি টাকা। কিন্তু এই হিসাবটা অন্তত এটুকু বুঝতে সাহায্য করে যে কৃষককে দেওয়া তথাকথিত 'ক্ষতিপুরণেরক্স অঙ্কটা তার ফসলের ক্ষতির সামান্য অংশ মাত্র, যে ফসল কৃষক বংশপরম্পরায় ভোগ করতে পারতেন। আর এই 'ক্ষতিপূরণে' প্রকৃত ক্ষতির ৯৫ শতাংশই বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। এটা শুধু একটা ছোট ফাঁক বা ফাটল নয়, এক বিরাট গহ্বর, যা ভরাট করা দরকার।

সমাজের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, শিল্পের নয়

কৃষিজমি যখন এক কৃষক থেকে অন্য কৃষকে হস্তান্তরিত হয়, জমির চরিত্র অপরিবর্তিতই থাকে। ফসল উৎপাদন ছাড়া ঐ জমির সমস্ত প্রাকৃতিক (ইকোসিস্টেম) পরিষেবাগুলি অক্ষুন্ন থাকে। উৎপাদিত ফসল ঐ জমির কৃষক মালিক ভোগ করলেও প্রাকৃতিক পরিষেবাগুলির সুফল আগের মতোই এলাকার সমগ্র মানবগোষ্ঠী বা কৃষক সমাজ ভোগ করে, জমিটির চারপাশের পরিবেশ ভারসাম্য বজায় থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কেঁচোরা উপরিমৃত্তিকা (topsoil) গঠন করতেই থাকে, জমির পুষ্টি ছড়িয়ে দিতেই থাকে এবং জল বাতাস চলাচলের জন্য মাটির গঠন, প্রবেশ্যতা ইত্যাদি ধর্ম বজায় রাখে। একটি হিসাবে অনুযায়ী কেঁচো বছরে হেক্টর প্রতি ১০ টন মৃত্তিকা নীচ থেকে উপরে স্থানান্তরিত করে।

কিন্তু এই জমি যখন শিল্পের জন্য রূপান্তরিত হয়, তার চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। জমিটির প্রাকৃতিক পরিষেবাগুলি ব্যাহত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের সুফল থেকে বঞ্চিত হয় স্থানীয় সমাজ এবং পরিবেশ। কাজেই এই প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ শুধু তাঁরাই হন না যাঁরা জীবিকার জন্যই সরাসরি কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকেন, বা কৃষিজাত দ্রব্যগুলিকে সংগ্রহ করা, বয়ে নিয়ে যাওয়া বা বাজারজাত করায় অংশ নেন, ক্ষতিগ্রস্থ হন তাঁরাও যাঁরা কোনভাবে ঐ জমিতে উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে যুক্ত নন, কিন্তু গোষ্ঠীগতভাবে ও সমাজিকভাবে ঐ জমিকে ধারণ করে রাখেন। ক্ষতিগ্রস্থ হয় আশেপাশের অন্যান্য জমি জীবকুল জল ও বাতাস। কাজেই শুধুমাত্র জমির মালিককে বা কৃষিকর্মে সরাসরি নিযুক্ত অন্য মানুষদের বাজারদরে 'ক্ষতিপূরণক্স দিলেও, স্থানীয় গোষ্ঠী ও সমাজের এবং পরিবেশের ক্ষতির পূরণ কোনভাবেই হয় না। বরং এই ক্ষতি আরো ক্ষতিই ডেকে আনে।

কৃষিজমি যদি শিল্পের জন্য রূপান্তর করতেই হয়, তাহলে তিনদিক থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা দরকার - এক, কৃষক ও কৃষিকর্মীর জীবকিার ক্ষতিপূরণ, দুই, স্থানীয় সমাজ ও গোষ্ঠী (কৃষক-কৃষিকর্মী সহ) - তাদের সামাজিক পুর্নবাসন এবং তিন, তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশের বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা বা ন্যূনতম রাখার জন্য উপযুক্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা। যদি শিল্পপতি বা অনুরূপ জমি-ব্যবহারকারীরা এইসব দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন, তাহলে স্পষ্টতই তাঁরা জমির সামগ্রিক মূল্যকেই গ্রাস করেন এবং লুকনো এই মূল্য তাঁদের মুনাফা ও পুঁজিতে প্রতিফলিত হয়। কারণ, এতদ্বারা শিল্পোৎপাদিত পণ্য বা পরিষেবার উৎপাদনের খরচের অনেকটা 'বাইরেক্স চালান করে দেওয়া যায়, এবং মুনাফা অনেকটা বেশী করা যায়। অবশ্য, ক্ষেত্রবিশেষে ঐ শিল্পপণ্য বা পরিষেবার বিক্রয়মূল্য যতোটা হবার কথা ততটা হয় না এবং ক্রেতারাও একটা হিস্যা ভোগ করেন। শিল্প এলাকার সমাজ ও পরিবেশ প্রধানত দায়ভাগী হয়। এর উপর যখন আশেপাশের পরিবেশ দূষিত হয়ে ওঠে, পানীয় জলে টান পড়ে বা দূষিত হয়ে পড়ে, বাতাসেও পড়ে দূষণের নানা প্রভাব - তখন অবশিষ্ট জমির উৎপাদন কমতে থাকে, মানুষজনের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকে, কর্মক্ষমতা কমে যায়। সেসবের মোকাবিলা যদি করতে হয়, তবে তার জন্যও খরচ করতে হয় ব্যক্তি নাগরিক এবং সরকারকেই। শিল্পপতির গায়ে আঁচড়টি লাগে না, তার মুনাফা আরও স্ফীত হয়।

কোন জমির মূল্যায়ণ এভাবে করলে, জমিটি উর্বর না অনুর্বর, একফসলি না বহুফসলি এসব অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব বিতর্কের আর কোন দরকারই পড়ে না। যেটা করা

দরকার তা হল জমির ''প্রাকৃতিক মূলধন ও ইকোসিস্টেম পরিষেবা''র বাস্তবসম্মত পুর্বানুমান। শস্য বা ফসল উৎপাদন এবং অন্যান্য পরিষেবার আপেক্ষিক অনুপাত বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, একটি অরণ্য এবং একটি উপকূলীয় জলাজমির ক্ষেত্রে এই অনুপাতে যথেষ্ট পার্থক্য হতে বাধ্য। এক শস্যক্ষেত্রের সঙ্গে অন্য শস্যক্ষেত্রেরও এই অনুপাতে পার্থক্য হতেই পারে। যেমন ধারা যাক সিঙ্গুরের কৃষিজমি এবং পস্থনগরের কৃষিজমি। এইসব হিসাবনিকাশের পন্থাপদ্ধতি এখন জানা হয়ে গেছে - কিছু পরীক্ষা নিরিক্ষা, ক্ষেত্র সমীক্ষণ ও নিবন্ধীকৃত তথ্যাদির সাহায্য নিয়ে এই হিসাব করা খুবই সম্ভব, যদি আমাদের সেই সদিচ্ছা থাকে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানাদির এবং বিশেষজ্ঞের সাহায্য পরামর্শও সহজেই পাওয়া যেতে পারে।

যে ক্ষতি অপূরণীয়

বাস্তুসংস্থান হিসেবে কৃষিজমি (বা অরণ্য বা উপকূলীয় জলাজমি ইত্যাদির) প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সচেতন না হলেও গভীর অনুভূতি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীদের আন্দাজ উপলব্ধিতে তা বারবার ধরা পড়েছে, শিল্পে - সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটে আসেছে বহু দিন ধরে বহুভাবে। রবীন্দ্রনাথের ''দুই বিঘা জমি'' কিংবা ''ভূসম্পদের বিত্তহরণ'' (The Robbry of the Soil) -এরকমই দুটি উদারহণ। এই ধরনের চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন দেখা যায় জমির চরিত্রবদল - বিরোধী আইনে। ভারতে এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এমন আইন বলবৎ আছে। এবং আইন ভেঙেই প্রায় সর্বত্রই বদলে যাচ্ছে অরণ্য, কিংবা উপকূল কিংবা কৃষিজমি - অবশ্যই পুঁজির ও ধনিকের স্বার্থে। জমির মোহে আবিষ্ট কৃষক, জমিকেই আঁকড়ে থাকতে চায়, সে পরিবর্তনবিরোধী এবং সামন্তবাদী ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন - এহেন কৃষক-মূল্যায়ণ এখনও বয়ে বেড়ানোর আর অবকাশ নেই বলেই মনে হয়। কৃষকরাও প্রকৃতির জীবধাত্রীর পরিষেবা সম্পর্কে সংবেদনশীল যদিও তাঁরা হয়তো আত্মসাতের কায়দাকানুনটা ঠিক বুঝে ও যুঝে উঠতে পারেন না।

যখন জমি ও অন্যান্য বাস্তুসংস্থানের ভূমিকা ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকখানি গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে, এমনকি স্কুলপাঠ্য বইতেও যখন সেই জ্ঞান ও তথ্যাদি পরিবেশন করা হচ্ছে, তখনও শতাব্দীপ্রাচীন মূঢ় আইনের সাহায্যে বলপূর্বক কৃষক ও অন্যান্য চিরাচরিত ভূসম্পর্কিত মানুষজনকে বিচ্ছিন্ন করে শিল্পের জন্য জমিকে রূপান্তরিত করায় নির্বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারছে বিভিন্ন রকমের সরকার - এটা খুব আশ্চর্যের ও পারিতাপের বিষয়।

ভারতে ''জমি অধিগ্রহণ'' এবং ''স্থানান্তরণ ও পুনর্বাসন'' সংক্রান্ত দুটি নতুন আইন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এমনকি প্রস্তাবিত এই আইনেও অধুনালব্ধ জ্ঞানের পুরো স্বীকৃতি মেলেনি। কৃষককে জমির ভবিষ্য-মূল্যের (অর্থাৎ রূপান্তরের পরে যে বাজার-দাম হবে) নিরিখে ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাব করে এবং উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থার প্রস্তাব করে নবলব্ধ জ্ঞানের খানিকটা স্বীকৃতি দিতে চাইলেও, পরিবেশের ক্ষতিপূরণের দিকটায় ভ্রুক্ষেপই করা হয়নি। এমনকি নতুন প্রস্তাবিত অইনও সমকালীন বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা, প্রকরণ ও পদ্ধতির সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হতে চলেছে।

অন্যান্য জমিকে শিল্পের জমিতে পরিণত করতে গেলে জমির সূত্রেই যে একটি উদ্বৃত্তমূল্যের উদ্ভব হয় সেটা বোঝার ও মেনে নেবার সময় এসে গেছে। কৃষির তুলনায় শিল্পে আয় বেশী হবার রহস্য লুকিয়ে আছে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিরাট মূলধনকে শিল্পে আত্মসাৎ করার মধ্যে, এবং ইকোসিস্টেম তথা পরিবেশ পরিষেবাগুলোকে বেমালুম গায়েব করে ফেলার মধ্যে। এখনই যদি এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তবে গোলার্ধের দক্ষিণের শিল্প বুভুক্ষু নিরেট সরকারগুলি দ্রুত আর্থিক প্রগতির(দীর্ঘমেয়াদী সামগ্রিক উন্নয়নের নয়) ধুয়ো তুলে জমি-বুভুক্ষু আগ্রাসী পুঁজির হাতে জমির উপঢৌকন দিতেই থাকবে, হোমো স্যাপিয়েনসের একমাত্র বাসস্থান এই পৃথিবীর ধ্বংস ত্বরান্বিত ও অনিবার্যই করবে তা।

রোজগারহীনদের জন্য কাজের ব্যবস্থাই হোক উন্নয়নের আপাতত লক্ষ্য

রবীন চক্রবর্ত্তী

কেন্দ্রীয় সরকার এক নাগাড়ে 'ইকনমিক গ্রোথক্স - এর কথা বলে চলেছে। জিডিপি (GDP) বাড়ছে, তাতেই খুশি। কিন্তু প্রশ্ন সেটাই কি সব? জিডিপি মানে দেশে এক বছরে পণ্য এবং সেবা হিসেবে যা কিছু উৎপাদন হয়েছে টাকার অঙ্কে তার মূল্য। এই উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবা কাদের ভোগে লাগল তা এই অঙ্কের মধ্যে লেখা নেই। স্বভাবতই যাদের পকেটে রেস্ত আছে তারাই ভোগ করছে। যাদের নেই তারা দর্শক। ফলে জিডিপি বাড়লে দরিদ্র মানুষদের কিছু এসে যায় না। এই অঙ্ক দিয়ে উন্নয়নের হিসেব বোঝা যায় না। সমাজের সব অংশের মানুষ এর সুফল পাচ্ছে কিনা বোঝা যায় না। বোঝা যায় না দরিদ্র মানুষদের দুর্দশা কাটছে কিনা। তথাপি জিডিপি নিয়েই সোরগোল চলচে। বলা হচ্ছে দ্রুত শিল্পায়ন মানে দ্রুত উন্নয়ন। এজন্য দেশি বিদেশী বিনিয়োগকারি ব্যবসায়ীদের খাতির করে ডেকে আনা হচ্ছে। গরীব মানুষদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে শিল্প-মালিক ও ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় বিনি পয়সায় জল ও বিদ্যুত দেওয়া হচ্ছে। ঋণ দেওয়া হচ্ছে। কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো কত কী দেওয়া হচ্ছে জানা নেই। সেসব ট্রেড-সিক্রেট। রাজ্যে রাজ্যে এমন জমি দখল আর ছাড়ের প্রতিযোগিতা চলছে। এই লুঠপাটের নাম দেওয়া হয়েছে উন্নয়ন।

দরিদ্র মানুষদের ভাগ্য এই ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার হাতে ছেড়ে রাখলে কতদিনে এদের অবস্থার পরিবর্তন হবে কেউ জানে না। তাই এদের জন্য আলাদা করে অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই অর্থে কাজ নেই যাদের, তাদের হাতে কাজ দিতে হবে। ভিক্ষে হিসেবে নয়, শ্রমের বিনিময়ে তারা পাবে সেই অর্থ। ভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পে লাগানো হবে তাদের শ্রম। বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থানের মানুষের কাছে উন্নয়নের বস্তুগত প্রয়োজন আলাদা। যে খেতে-পরতে পাচ্ছে তার প্রয়োজন আর যে পাচ্ছে না তার প্রয়োজন এক নয়। যারা পাচ্ছে না তাদের জন্য ভাবনাই উন্নয়নের আপাতত লক্ষ্য হোক।

এক সময় উন্নয়নের মানে ছিল খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা বাসস্থান .....!!!

আগে সাধারণ মানুষ উন্নয়ন বলতে বুঝত সরকার তাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট, পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে। এই ব্যবস্থা কে কতটা পারল সেই অনুযায়ী মানুষ সরকারের ভালমন্দ বিচার করত। সেসব সংজ্ঞা এখন বাতিল। শিল্পায়নের ঢাকের বাদ্যির আড়ালে উন্নয়নের অর্থটাই বদলে দেওয়া হয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভার ক্রমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর্থিক সংস্কারের নামে সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির বন্দোবস্ত করার কাজ থেকে সরে আসছে সরকার। আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ইত্যাদির আর্থিক নির্দেশ মত সেই অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে নতুন শহর গড়ে তোলা হচ্ছে। পুরনো শহর নতুন করে

ব্যাপারটাকে পরিবারের অর্থনীতির মত করে দেখলে চলবে না। দেখতে হবে গোটা দেশের হরেক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নিরিখে। এই যোজনার মাধ্যমে ব্যয়িত অর্থ সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারলে শুধু টাকার অঙ্কেই নয়, নানান ভাবে ফিরে আসবে তা। এই কথাটাই মাথায় রাখতে হবে। গ্রামে গ্রামে স্থানীয় উৎপাদন-অর্থনীতির চাকাটা একবার ঘুরতে শুরু করলে এর আর্থিক ও সামাজিক সুফল পেতে দেরি হবে না।

সাজানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে এসব হল 'বিনিয়োগ - বন্ধু' পরিবেশের অঙ্গ। এসব না থাকলে দেশি বিদেশি ব্যবসায়ীরা এখানে টাকা লগ্নী করবে না। লগ্নী না হলে শিল্প কারখানা হবে না। তাহলে উন্নয়নও হবে না। এই তাদের যুক্তি। এর ফলে দেশে ক্রোড়পতির সংখ্যা বাড়ছে। সে খবর পত্রপত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। দেশ উন্নত (!) হচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু তা সত্বেও দরিদ্রের সংখ্যা কেন বাড়ছে এই ধাঁধাঁর উত্তর পাচ্ছি না।

সরকারের হাতে টাকা নেই, উন্নয়নের জন্য টাটা আম্বানীরাই ভরসা

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার, গুজরাটের বিজেপি সরকার, পশ্চিমবঙ্গের বাম তথা সিপিএম সরকার, সকলেই এই উন্নয়ন উদ্যোগের শরিক। সবার এক সুর। উন্নয়ন মানে টাটা, আম্বানী, সালেম, জিন্দাল, মিত্তালদের সুবিধে দিয়ে ডেকে আনা। যুক্তি হল সরকারের হাতে টাকা নেই। তাই তাদের ডেকে আনতে হচ্ছে। তারা কারখানা বানাবে, রাস্তা বানাবে, ব্রিজ বানাবে, শহর বানাবে, ব্যবসা করবে। এতেই উন্নয়ন হবে। কারণ কলকারখানা হলে তার জন্য শ্রমিক লাগবে, ইঞ্জিনীয়ার-ম্যানেজার-ক্লার্ক লাগবে, হিসাব-রাখার লোক - সিকিরিউটি গার্ড - ক্যান্টিনবয় লাগবে, কমপিউটার জানা এবং এমন আরো অনেক ধরনের কাজের লোক লাগবে। লোকের চাকুরি হবে। (অবশ্য ক'টা চাকুরি হবে তা নিয়ে আছে ঘোরতর সন্দেহ।) রোজগার হবে। রোজগারের টাকায় বাজার থেকেই সব কিনে নেওয়া যাবে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য - কী চাই? সবই বাজারে থাকবে। কিনে নিলেই হল। চাকুরি করছেন বা করছেন না, সকলেই কিনে নিতে পারবেন!

এই উন্নয়ন চুঁইয়ে একদিন পৌঁছে যাবে আমলাশোল!

এই উন্নয়নপন্থীদের দাবী যে এইভাবে চলতে থাকলে এর সুফল এক সময় দেশের সব থেকে নীচের তলার মানুষ অবধি পৌঁছে যাবে .....! কীভাবে নীচের দিকে চোঁয়াবে, এতদিনেও কেন চোঁয়ালো না বা কতদিনে চোঁয়াবে সেসব প্রশ্নের উত্তর নেই। শুধু তাদের এই বিশ্বাসটায় আমাদেরকেও বিশ্বাস রাখতে বলা হচ্ছে। এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাচ্ছে না। প্রশ্ন তুললে বলা হচ্ছে এরা উন্নয়ন বিরোধী!

কে বলেছে উন্নয়ন হচ্ছে না?

হ্যাঁ, দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেড়েছে। একথা মানতেই হবে। এই বৃদ্ধির হার পৃথিবীর অনেক দেশের থেকে বেশি। তাও সত্যি। কিছু মানুষের অবস্থা সত্যি-ই ভাল হয়েছে। তার নানান লক্ষণ দেখছি। যারা শহরে থাকি দেখি। রাস্তায় হরেক মডেলের গাড়ি, পেল্লায় বিলাসবহুল অফিস ও বসত বাড়ি, ঝলমলে শপিং মল, থরে থরে সাজানো দেশি-বিদেশী জিনিষ, সেখানে সুখী মানুষদের ভীড়, এখানে ওখানে ফ্লাইওভার, শহর থেকে শহরে দ্রুত যাতায়াতের জন্য এক্সপ্রেসওয়ে, - এসব অবশ্য-ই উন্নতির লক্ষণ। এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলছে না। প্রশ্ন উঠছে এর সুফলভোগী কারা তাই নিয়ে।

মার্কিন দেশের মোট জনসংখ্যার থেকে বেশি মানুষ এদেশে অনাহারে থাকে

প্রশ্ন হল দেশের কতজন মানুষ এই উন্নতির অংশীদার? দেশের অর্দ্ধেক মানুষও কী? - না, তা নয়। ছিঁটেফোঁটা সুবিধাভোগ অবধি ধরেও খুব বেশি হলে দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ এর সুফলভোগী। বেশির ভাগই এর বাইরে পড়ে থাকছে। সংখ্যার হিসেবে বাহাত্তর থেকে তিয়াত্তর কোটি মানুষ তারা। এদের মধ্যে একদম নীচের দিকে প্রায় তিরিশ - বত্রিশ কোটি মানুষের অবস্থা ভয়ঙ্কর রকম খারাপ। এতটাই খারাপ যে বছরের অনেকটা সময় তাদের অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হয়। তাদের হাতে কাজ থাকে না তাই। সংখ্যাটা কত বড় বোঝানর জন্য জানাই যে এই সংখ্যাটা মার্কিন যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি!

শিল্পের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে দরিদ্রদেরই

আর্থিক সংস্কারের নামে একদিকে সামাজিক সুরক্ষার সুযোগগুলি উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্য দিকে কল কারখানা শহর বন্দর সেজ রাস্তা পার্ক ইত্যাদি নির্মাণের নামে দরিদ্র মানুষদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। উন্নয়নের

জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে দরিদ্র মানুষজনদেরই। যারা এর সুফলের ভাগীদার নয়। শিল্প কারখানার জন্য পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির মূল্যও দিতে হয় তাদেরই। একটি দৃষ্টান্ত। দেশ জুড়ে পানীয় জলের সমস্যা। সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে বোতল - ভর্তি জল। এজন্য গ্রামে গঞ্জে কারখানা বসছে। মাটির তলা থেকে হাজার হাজার গ্যালন জল টেনে তোলা হচ্ছে। সেই জল বোতল ভর্তি হয়ে চলে যাচ্ছে শহরাঞ্চলে। এদিকে গ্রামে মাটির নীচে জলের তল নেমে যাচ্ছে। কারখানা - ঘিরে বিস্তীর্ণ এলাকায় জলের অভাব দেখা দিচ্ছে। সেখানকার মানুষ পানীয় জলের অভাবে হাহাকার করে মরছে!

আধুনিক প্রযুক্তির পরিণতি 'জবলেস গ্রোথ'

যে চাকুরির দোহাই পেড়ে এত সব কান্ড, সেই চাকুরির ব্যাপারটাও বেশ গোলমেলে। বিনিযোগ বাড়ছে। শিল্প, কল-কারখানা, রাস্তাঘাট, অফিস-বাড়ি, ব্রিজ, ফ্লাইওভার, ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে কর্মসংস্থান বাড়ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়ছে। সামন্যই বাড়ছে। অন্যত্র কমছে। এত কমছে যে নীট হিসেবে কর্মসংস্থান কমছে। ইস্পাত কারখানায়, গাড়ি কারখানায়, সিমেন্ট কারখানায়, টেলি-যোগযোগ ব্যবস্থায়, খনি-শিল্পে, রাস্তা তৈরিতে, ব্রিজ তৈরিতে, সর্বত্র এক চিত্র। টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে, উৎপাদন বাড়ছে, কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ছে না। একেই বলে 'জবলেস গ্রোথ' ! একটি দৃষ্টান্ত। জামশেদপুরে টাটার ইস্পাত কারখানায় ১৯৯১ সাল থেকে দশ বছরে উৎপাদন বেড়েছিল পাঁচ গুণ। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যেই কর্মীসংখ্যা কমে প্রায় অর্ধেক হয়েছিল।

আধুনিক কল কারখানা মানেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নির্ভর ব্যবস্থা। একটি সিমেন্ট কারখানার এক সময় হাজার খানেক লোক কাজ করত। আজ সেই মাপের কারখানাই শতখানেক লোক দিয়ে চলে। গাড়ির কারখানায় অনেক কাজই আজ স্বয়ংক্রিয় রোবটের সাহায্যে করা হয়। এমন কী রাস্তা তৈরীর মত মোটা দাগের কাজও বড় বড় যন্ত্রপাতি লাগিয়ে কম লোক দিয়েই হয়ে যাচ্ছে। এবং শত শত মাইল রাস্তা অতি অল্প সময়ে তৈরী হয়ে যাচ্ছে। একই কাজ যন্ত্রের বদলে বেশি মানুষ লাগিয়েও হতে পারত। কিন্তু এখন আর তা হবার নয়। এখন সময়ের অনেক দাম। সময় বেশি লাগা মানে লাভের অঙ্ক কমা। সেটা হতে দেওয়া যায় না। ফলে প্রচুর বিনিয়োগের হিসেব কষে লাভ নেই। প্রচুর বিনিয়োগের সাথে চাকুরির গল্পের কোনো যোগ নেই। ঘটনা হল গত দেড় দশক ধরে এদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ উৎপাদনের নানান খাতে বিনিয়োগ সত্ত্বেও ১৯৯৮ সালের পর থেকে গোটা দেশে কলে-কারখানায় মোট কর্মীসংখ্যা কমে গেছে। সরকার প্রকাশিত তথ্যই একথা বলছে।

দেশের লোকে চাকরি পাবে এজন্য শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করে না

দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারিরা আসছে। কলকারখানা হচ্ছে। উৎপাদন হচ্ছে। সেই পণ্য দেশের লোক কিনতে পারল কিনা দেখার দরকার নেই। গোটা দুনিয়াটাই তাদের বাজার এখন। সেখানকার লোক কিনতে পারে সেখানেই সে বেচবে। এটাই হিসেব। এতেই সমস্যা হচ্ছে। দুনিয়ার বাজারে সে একা নয়। তার মত অনেকেই আছে সেখানে। ফলে প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পণ্যের দাম কমাতে হয়। উৎপাদন ব্যয় কমাতে হয়। কমানর একটাই রাস্তা। মজুরি খাতে ব্যয় কমান। মানে কম লোক দিয়ে বেশি কাজ করান। সেটাই করছে ব্যবসায়ীরা। সেটাই স্বাভাবিক। তাই দেখা যাচ্ছে বিনিয়োগ বাড়ছে, শিল্প - কলকারখানা বাড়ছে, জিডিপি বাড়ছে। মানুষের চাকুরি বাড়ছে না। রপ্তানী কেন্দ্রিক উৎপাদন হলে এটাই হবে। দেশের লোক কাজ হারাবে। লোকের আয় কমবে। দেশের বাজার আরও সংকুচিত হবে। উৎপাদনকারিদের বেশি করে রপ্তানী বাজারের পিছনে ছুটতে হবে। এ এক গভীর গাড্ডা। সরকার বিনিয়োগকারিদের যতই সুবিধে দিয়ে তোয়াজ করে ডেকে জিডিপি বাড়ানোর উদ্যোগ নিন না কেন, এতে মালিকদের সিন্দুক ভরবে। কিন্তু ওই সম্পদের সামান্যই দরিদ্র জনসাধারণের কাছে পৌঁছাবে।

এই অবস্থায় কী করা দরকার সেটাই ভাববার বিষয়। এই মুহূর্তে এমন কোনো শক্তি নেই যে উন্নয়নের এই ধারাকে প্রতিহত করে। ফলে দেশের পঁচিশ ত্রিশ শতাংশ মানুষকে নিয়ে উন্নয়নের এই ধারা আপাতত অব্যহত থাকবে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ব্যবস্থা বদলানর জন্য কঠিন রাজনৈতিক লড়াই এর প্রয়োজন। সে চেষ্টা চালাচ্ছে অনেকে। সে লড়াই চলতে থাকবে। এখনই শেষ হবার নয়। এই অবস্থায় ভেবে দেখা দরকার যে উন্নয়ন কেমন হলে উন্নয়নের উদ্যোগ সমাজের দরিদ্রতম অংশের মানুষ অবধি ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কিভাবে দরিদ্রতম অংশের মানুষকে এর অংশীদার তো বটেই, পরিচালকও করে নেওয়া যায়।

দরিদ্রদেরও সামিল করা যায় উন্নয়নের উদ্যোগে

এই নিয়ে ভাবছেন কেউ কেউ। এর জন্য সম্ভাব্য একটি উন্নয়ন কর্মসূচির কথা বলেছেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমিত ভাদুড়ী। ''ডেভেলপমেট উইথ ডিগনিটি - এ কেস ফর ফুল এমপ্লয়মেন্ট সোসাইটি'' নামের বইটিতে। তিনি দেখিয়েছেন যে চাইলে দরিদ্রতম অংশের মানুষদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে নেওয়া যায়। এই উদ্যোগে অংশীদার করা যায়। তিনি বলেছেন দেশের দরিদ্রতম অংশের মানুষের হাতে কাজ জুটিয়ে দিতে হবে। ন্যূনতম মজুরিতেই। এই শ্রম গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজে লাগাতে হবে। এর থেকে যে সম্পদ সৃষ্টি হবে সেটা গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনবে তাতেই ফের নতুন নতুন কর্মসংস্থান হবে। নীচ থেকে শুরু হবে উন্নয়ন।

গরীবদের জন্য আলাদা বাজার আলাদা অর্থনীতি

আসলে যেটা বলা হয়েছে তা হল সাময়িক লক্ষ্য হিসেবে হলেও মানুষদের ঘিরে তাদের মত করেই একটা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কথা ভাবা দরকার। যেখানে তাদের আশু প্রয়োজনগুলিকে ঘিরেই উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হবে, তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও বাজার গড়ে উঠবে। গ্রামের মানুষদের হাতে কাজ জুটিয়ে দিতে পারলে তাদের রোজগারের টাকা নিয়ে তারা ক্রেতা হিসেবে বাজারে ভীড় করবে। নতুন করে চাহিদা সৃষ্টি হলে সেই চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থাও গড়ে উঠবে। ছোট আকারের সেই উৎপাদন ব্যবস্থা দিয়েই সেই চাহিদা পূরণ করা যাবে। ছোট আকারের উৎপাদন ব্যবস্থা মানে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক মানুষের যুক্ত হওয়া। আধুনিক বড় শিল্পে যেখানে গড়ে এক কোটি টাকা বিনিয়োগে গুটি কয়েক চাকুরি হয়, সেখানে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পে ওই টাকায় এক' শর বেশি লোকের কাজ জুটতে পারে। এই প্রক্রিয়াটিকেই সক্রিয় করে তুলতে হবে।

গরীবদের মত করে একটা বাজার-অর্থনীতি আমাদের দেশে সব সময়ই ছিল। এখনও আছে। গরীব মানুষদের হাতে কাজ জুটলে, তাদের রুজি রোজগার একটু বাড়লে সেই বাজারটাই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সেটাই আপতত লক্ষ্য হওয়া উচিত। অগ্রগতির একটা স্তর হিসেবে এটাকে দেখতে হবে। গরীবদের বাজার প্রসারিত হলে বৃহৎ পুঁজি এক সময় সেই বাজারের দখল নেবার জন্য এগিয়ে আসতেই পারে। কিন্তু সেটা এক্ষুণি হচ্ছে না। তার জন্য সময় লাগবে। এই নিয়ে এখুনি ভাবনার প্রয়োজন নেই।

জাতীয় গ্রামীন রোজগার সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্প - একটি সুযোগ

অধ্যাপক ভাদুড়ীর মতে এই প্রক্রিয়া শুরু করার একটা সুযোগ উপস্থিত এখন। ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট নামে একটি আইন চালু করেছে ভারত সরকার। যাতে দেশের দরিদ্রতম অংশের মানুষের জন্য ন্যূনতম মজুরিতে বছরে অন্তত একশ দিন কাজের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর জন্য টাকা যা লাগবে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে। গ্রামে দরিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী মানুষদের জন্য এই প্রকল্প। আইনটি বলবৎ হয়েছে ২০০৫ সালে। প্রথমে দেশের সব থেকে পিছিয়ে পড়া কিছু জেলাতে চালু হয়। তারপর এই বছর থেকে গোটা দেশেই চালু হয়েছে।

এই প্রকল্পটি কার্যকর হলে গ্রামের দরিদ্র মানুষজন অন্তত একক্সশ দিন কাজ পেতে পারবে। তিন বছর হল এই

প্রকল্প চালু হয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্প কার্যকর করার আন্তরিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। বেশির ভাগ রাজ্যই এই প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে দরিদ্র মানুষদের হাতে কাজ জোটানর ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখায় নি। বোঝাই যায় এই অনাগ্রহের পেছনে কায়েমি স্বার্থের হাত আছে। গ্রামে চল্লিশ টাকা দৈনিক মজুরিতেও লোক পাওয়া যায়। সরকারি প্রকল্পের কাজে সত্তর আশি টাকা মজুরি দেওয়া হবে। তাহলে কাজের লোক সব সেখানেই চলে যাবে। সস্তায় মজুর সাপ্লাইয়ে টান পড়বে। গ্রামের কায়েমি স্বার্থ তাই এই প্রকল্প বানচালের চেষ্টা করবে, সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু যদি এই প্রকল্প কার্যকর করা যেত এবং আগামী দিনে এক' শ দিনের জায়গায় সারা বছরের জন্য কাজের গ্যারান্টি আদায় করা যায়, তাহলে এর ফল সুদূরপ্রসারি হবে। মনে রাখতে হবে এটা এককালীন অনুদান নয়, কাজের গ্যারান্টি। পরোক্ষে মানুষের কাজের অধিকার মেনে নিয়েছে সরকার। আংশিকভাবে হলেও কাজ দেওয়ার দায়িত্বও সরকার নিয়েছে। অন্তত তেমন অঙ্গীকার করেছে। এখন এটা কার্যকর না হলে এই অঙ্গীকার থেকে পিছিয়ে আসতে পারে সরকার। কোনো অজুহাতেই যাতে তারা সেটা না করতে পারে সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য। এই নিয়ে জনমত তৈরি করতে হবে। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

টাকা আসবে কোথা থেকে

সরকারের হাতে টাকা নেই এমন ঘোষণা প্রায়ই শোনা যায়। সেই অজুহাতে এই প্রকল্পে টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সরকারের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে এই বোঝা তাদের অনন্তকাল বইতে হবে এমন না। যদি একটু ভাবনা চিন্তা করে পরিকল্পনা করে মানুষের শ্রম কাজে লাগান যায় তাহলে যে সম্পদ সৃষ্টি হবে তাতে একসময় মজুরি খাতে খরচ হওয়া টাকা নানান ভাবে উঠে আসতে শুরু করবে। ততদিন কেবল সরকারকে এই দায় বহন করতে হবে। টাকা কোথা থেকে আসবে উত্তরে বলতে হয় সরকার যেভাবে অর্থ সংগ্রহ করে সেভাবেই করবে। ধনীদের এত সুবিধে দিয়ে ফুলেফেঁপে উঠতে সাহায্য করছে সরকার। সেই ধনীদের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে টাকা তুলবে। প্রশাসনিক খরচ কমাবে। প্রতিরক্ষা খাতে অর্থহীন খরচ কমাবে।

এই মুহূর্তে এই প্রকল্পের জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেটা আমাদের দেশের বাৎসরিক বাজেট অঙ্কের তুলনায় খুব বড় নয়। ধরা যাক তিন কোটি মানুষকে এই প্রকল্পে কাজ দিতে হবে। মাথা পিছু দৈনিক এক' শ টাকা হিসেবে খরচ ধরলে এক'শ দিন কাজ দিতে লাগবে বছরে তিরিশ হাজার কোটি টাকা। আর এই কাজের জন্য বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের জন্য লাগবে ধরা যাক আরও কুড়ি হাজার কোটি টাকা। মোট পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা। আমাদের দেশের পক্ষে টাকাটা খুব বেশি নয়। বর্তমান বছরের মোট বাজেট অঙ্কের মোটামুটি সোয়া ছয় শতাংশের মত। এই তো সেদিন চাষিদের ব্যাঙ্ক-লোন মকুবের জন্য ষাট হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। পরে বরাদ্দ বাড়িয়ে পঁচাশি হাজার কোটি করা হয়েছে। কই এর পর তো দেশের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি!

ব্যাপারটাকে পরিবারের অর্থনীতির মত করে দেখলে চলবে না। দেখতে হবে গোটা দেশের হরেক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নিরিখে। এই যোজনার মাধ্যমে ব্যয়িত অর্থ সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারলে শুধু টাকার অঙ্কেই নয়, নানান ভাবে ফিরে আসবে তা। এই কথাটাই মাথায় রাখতে হবে। গ্রামে গ্রামে স্থানীয় উৎপাদন-অর্থনীতির চাকাটা একবার ঘুরতে শুরু করলে এর আর্থিক ও সামাজিক সুফল পেতে দেরি হবে না।

দরকার হলে নোট ছাপাক সরকার

এরপরও অধ্যাপক ভাদুড়ীর পরামর্শ হল যদি একান্তই অর্থের অভাব হয় সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সরকার নোট ছাপিয়েই টাকাটা দিতে পারে। এতে ঘাটতি বাজেট হবে। তা হবে। এতে দেশ রসাতলে যাবে এমন ভাবার কারণ নেই। নোট ছাপানোর কথা শুনে সরকারের পরামর্শদাতা অর্থনীতিবিদরা ঘাবড়ে যেতে পারেন। অধ্যাপক ভাদুড়ী তাদের ঘাবড়াতে মানা করেছেন। তিনি বলছেন এর ফলে মূল্য বৃদ্ধির ঘটনা যে ঘটবেই তার কোন মানে নেই। দেশে যোগানের অবস্থা যদি

ঠিকঠাক থাকে তাহলে সেটা হবে না। এই মুহূর্তে দেশে উৎপাদন পরিস্থিতি ভালই। কিছু কিছু শিল্প-ক্ষেত্রে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা আরও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। দরকার হলে উৎপাদন বাড়ান হবে। তা ছাড়া দরকার পড়লে জিনিষপত্র আমদানি করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার অভাবও নেই আমাদের এই মুহূর্তে।

ঘাটতি বাজেট করার ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে আইনগত বাধার কথা উঠতে পারে। একটা আইন করেছে ভারত সরকার। নাম হল এফ আর বি এম - আইন। পুরো কথা 'ফিস্‌ক্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট। সরকারের তরফে বাজে খরচ বন্ধ করার জন্য এই আইন। আপাতভাবে মনে হবে ভাল উদ্দেশেই করা হয়েছে এই আইন। আসলে করা হয়েছে স্টক মার্কেট - এর কথা ভেবে। দেশি-বিদেশী বিনিয়োগকারিদের নিশ্চিন্ত করতে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও আই এম এফ - এর মত আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাদের খুশি রাখতে। কিন্তু এই আইনের কারণে যদি গরীবদের জন্য তৈরী করা রোজগার প্রকল্পের টাকা বরাদ্দ বন্ধ করতে হয়, তাহলে আমাদের দাবী হবে সরকার এই আইন বাতিল করুক।

তবে কাজটা হতে হবে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা মাফিক

সব কিছু নির্ভর করছে প্রকল্পটির সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার ওপর। সত্যি কথা বলতে কী আমাদের দেশের পক্ষে টাকার থেকেও বড় সমস্যা হল কাজটা "সুষ্ঠুভাবে" করা। প্রশাসনের নানান পর্যায়ে রয়েছে দুর্নীতি আর বিভিন্ন স্বার্থের জটিল আবর্ত। তারপর গ্রাম স্তরে নানান বাধা তো আছেই। আছে নানান স্তরের কায়েমি স্বার্থ। আছে দলাদলি এবং তাই নিয়ে রেষারেষি। আছে শিক্ষার অভাব এবং দক্ষ কর্মীর অভাব। কাজ মানে কেবল কোদাল বেলচা মেরে মাটি কাটা তো নয়। নানান ধরনের কাজ করতে হবে। সেজন্য কিছু যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজন। এই সমস্ত বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে এই উদ্যোগকে সফল করতে হলে কাজের পরিকল্পনা এবং দায়িত্ব বন্টনের ব্যাপারে বিশেষভাবে ভাবতে হবে।

দায়িত্ব গ্রামের মানুষেরই

মানুষ নিজের উদ্যোগে যে কাজ গড়ে তোলে, সেই কাজ যত মমতায় এবং উৎসাহের সাথে করে ফরমায়েসি কাজ কখনই সেভাবে করে না। এই উৎসাহ এবং উদ্দীপনাটাই জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যেকার স্বতঃস্ফূর্ত কর্মোদ্যোগের প্রেরণাকে কাজে লাগাতে হবে। এজন্য পরিকল্পনা তৈরি করা থেকে রূপায়ণ অবধি সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে মানুষদের হাতেই। দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণের পথ ধরেই একসময় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে। তবে শুধু কথায় নয়, প্রকৃত অর্থেই এই বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। বিকেন্দ্রীকরণের নামে খানিকটা দায়িত্ব প্রশাসনের ওপরতলা থেকে নীচের তলায় নামিয়ে দেওয়া নয়। এমন কি স্থানীয় স্তরে শাসক দলের হাতে তুলে দেওয়াও নয়। গ্রামের মানুষের হাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তুলে দিতে হবে এবং সেইভাবেই প্রকল্পের বিধি-নিয়ম স্থির করতে হবে। গ্রামের মানুষ গ্রাম সভার মাধ্যমে তার দায়িত্ব পালন করবে এটাই রীতি।

বিধি প্রণয়নের সময় আরেকটি বিষয়ও মনে রাখতে হবে। দেখতে হবে টাকা বরাদ্দ হওয়ার পর কোনো পর্যায়েই সরকারি আমলাদের খবরদারির কোনো সুযোগ না থাকে। দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ওপর খবরদারির ভার রয়েছে তাদের ওপর। গরীবদের জন্য বরাদ্দ এই কটা টাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তাদের ক্ষমতা কমে গেল মনে করার কারণ নেই। গ্রামবাসীদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হোক টাকাকড়ি লেনদেনের ভার। চুরি-চামারি অপচয় অব্যবহার এই সমস্ত আশঙ্কা সত্বেও ঝুঁকিটা নেওয়া হোক।

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রাক্তন একজন প্রধানমন্ত্রীর একটি উদ্ধৃতি মনে করা যেতে পারে। তিনি আক্ষেপের সাথে বলেছিলেন আমাদের দেশে গ্রামের গরীবদের জন্য সরকারি বরাদ্দের প্রতি এক'শ টাকার মাত্র দশ টাকা প্রকৃতপক্ষে গরীবদের হাতে পৌঁছায়! আমলাতন্ত্রের বজ্র আঁটুনি সত্বেও যখন এই অবস্থা, তখন এক্ষেত্রে তাদের নজরদারির অভাবে যদি অবস্থাটা আরও খারাপ হয় তো হোক। এক'শ টাকায় দশ টাকার বদলে

যদি দেখা যায় পাঁচ টাকা পৌঁছচ্ছে, তাহলে তাই হোক। এই চোর তো গ্রামেরই কেউ হবে। তার মোকাবিলা গ্রামের গরীবগুর্বোরা কীভাবে করবে তাদেরকেই বুঝে নিতে দেওয়া হোক।

কাজ চাওয়াটা দয়া চাওয়া নয়

একজন সরকারি কর্মী কী মনে করে সরকার তার প্রতি দয়াবশত চাকুরিটা দিয়েছে? যে মানুষটি মাস মাইনেতে লোকের বাড়িতে কাজ করে সেও কী মনে করে তার প্রতি কেউ দয়া করছে? সে জানে রীতিমত গতর খাটিয়ে সে রোজগার করছে। এই প্রকল্পে যারা কাজ করবে তাদের মধ্যেও এই বোধটি যাতে কাজ করে দেখতে হবে। কাজ বন্টনের দায়িত্ব নিশ্চয়ই কারো উপর থাকবে। নিয়মকানুন এমনভাবে করতে হবে যাতে কাজ দেওয়ার ব্যাপারে দয়া দেখান হচ্ছে ভাব না দেখাতে পারে। কড়াকড়ি যা থাকার কাজের হিসেব বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে থাকুক। সেই ব্যাপারে এক'শ শতাংশ কঠোর হওয়ার এক্তিয়ার দেওয়া হোক সেই কর্তৃপক্ষের হাতে। কিন্তু কাজ দেওয়ার ব্যাপারে কোনো আধিকারিকেরই যেন গড়িমসি করার সুযোগ না থাকে দেখতে হবে।

প্রকল্প কীভাবে বাস্তবায়িত হবে

প্রকল্প বাস্তবায়নের দুটো ধাপ। পরিকল্পনা রচনা এবং তার রূপায়ণ। অর্থাৎ কী কাজ হবে আর কীভাবে করান হবে ঠিক করা। একদিকে সর্বত্রই রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, বনসৃজন, ইত্যাদির মত সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় কাজ থাকবে। অন্যদিকে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং সম্পদ নির্ভর উৎপাদনমুখী কাজকর্মও গড়ে তুলতে হবে। ফলে পরিকল্পনার কাজটা এলাকার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই হতে হবে। তবে কত ধরনের কাজ হতে পারে, তাতে কী কী নতুন ভাবনা যুক্ত হতে পারে এই সব সম্পর্কে কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা দরকার। দুনিয়াব্যাপী উন্নয়ন উদ্যোগের নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। সেসব অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে। সেই তথ্য জেলা থেকে গ্রামস্তর অবধি পৌঁছে দিতে হবে। এই কাজ কেন্দ্রীয়ভাবেই করতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। দরকারে এই জ্ঞানকে উন্নত করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন কারিগরিবিদ্যা চর্চা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া যায়। এগুলিই হতে পারে গ্রামে উন্নয়ন - উদ্যোগের সহায়ক কেন্দ্র। কাজের মান ঠিক রাখা, অপচয় রোধ করা এসবের জন্যও কারিগরি জ্ঞান দরকার। এই কেন্দ্রগুলি সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

যোজনার টাকা কী পদ্ধতিতে খরচ হবে তা নিয়ে বিশেষভাবে ভাবা দরকার। টাকা বন্টনের প্রথা প্রকরণের মধ্যেই চুরি-জোচ্চুরি-কারচুপি ইত্যাদির ভূত লুকিয়ে থাকে। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিগত ছিদ্রগুলি আটকাতে হবে। এর পর দেখতে হবে শ্রম দেওয়ার শেষে লোকেদের মজুরির টাকা পেতে না হয়রান হতে হয়। মজুরির টাকা সহজে পাওয়ার বন্দোবস্ত রাখা দরকার। কাজের হিসেব রাখায় কড়াকড়ি থাকুক। কাজ কড়ায় গন্ডায় বুঝে নেবার ব্যবস্থা থাকুক তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু কাজের শেষে মজুরির জন্য না হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় দেখতে হবে। নিয়ম থাকবে কাজের হিসেবে গরমিল বা কারচুপি ধরা পড়লে পরের বার আর টাকা পাওয়া যাবে না। এতেই কারচুপির অনেকটা কমে যাবে। আসলে টাকা হাতে পাওয়ার ব্যবস্থাটা যদি সহজ হয়, তখন টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাটা বড় হয়ে উঠবে। তখন কোনো কারণে টাকা না মার যায় সে ব্যাপারেও মানুষ অনেক বেশি সজাগ থাকবে। এর সাথে তথ্য জানার অধিকারের আইনটি কীভাবে কারচুপি বন্ধ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে সে ব্যাপারেও মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।

গ্রাম স্তরে প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব তো পঞ্চায়েতের। তারাই করাবে কাজ। কাজ বাছাই, কাজ বিলিবন্টন ও কাজের হিসেব, মজুরির হিসেব - এসব করবে পঞ্চায়েত। গোটা ব্যাপারটা তদারকির ব্যাপারে পঞ্চায়েতের সাথে গ্রামসভারও সক্রিয় ভূমিকা থাকতে হবে। এলাকার জন্য ঠিক ঠাক দরকার মতো কাজ বাছা হচ্ছে কি না, কাজের অগ্রগতি, কাজে গাফিলতি, কারচুপি ইত্যাদির ওপর নজরদারি করা, টাকা পয়সা

ঠিক ঠিক ব্যয় হচ্ছে কিনা দেখা, ঠিক ঠি ক লোক কাজ পেল কিনা দেখা, -এসবের দায়িত্ব নিতে হবে পঞ্চায়েতের সাথে গ্রামসভাকেও। মানে গ্রামের সবাইকেই। মিটিঙে সবাই বসবে, মত দেবে। কিন্তু সবাই করবে কথাটার মানে হয় না। এর জন্য কিছু পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। গ্রাম সভার প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গড়া যেতে পারে। কিন্তু দায়িত্ব সবার। সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য তথ্য জানার অধিকারের আইন বা সংক্ষেপে আর টি আই আইনটিকে হাতিয়ার করতে হবে। গোটা কর্মকান্ডকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে সাহায্য করতে পারে এই আইন।

আর টি আই আইন-ই হোক সুষ্ঠু রূপায়ণ ও দুর্নীতি রোধের হাতিয়ার

তথ্য জানার অধিকার (আর টি আই) আইনটি চালু হয়েছে বেশ কিছু দিন হল। এই আইনে বলা হয়েছে দেশের সমস্ত সরকারি অপিসে যত কাজকর্ম হয় তার নথিপত্র যেমন সরকারি নির্দেশ, চিঠিপত্র, আধিকারিকের দেওয়া নোট, কাজের খতিয়ান, নির্মাণ কাজের টেন্ডার - অর্ডার, কেনা-কাটার বিবরণ, খরচপত্রের হিসেব কোনো কিছুই গোপনীয় তথ্য নয়। সব তথ্যই চাইলে যে কেউ দেখতে পারে। কাগজপত্র সেভাবেই রাখার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। এমন কী সম্ভব হলে বিশেষ বিশেষ তথ্য অফিসের বাইরে নোটিশ বোর্ডেই টাঙিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয়। যাতে যে কেউ চাইলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। শুধু দেখতে চাইলে তার জন্য কোনো দরখাস্ত করারও দরকার নেই। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক কোনো নথি দেখাব না, বলতে পারেন না। বড় জোর বলতে পারেন এখন ব্যস্ত আছি। অমুক দিন আমুক সময়ে আসুন, দেখিয়ে দেব। লিখিত আকারে তথ্য চাইলে তার জন্য লিখিত জমা দিতে হবে। আইনটি এমনভাবেই রচিত।

দীর্ঘ দিনের অভ্যাস হেতু সরকারি দপ্তরে নিযুক্ত বয়-বাবু-সাহেবদের অনেকে এখনও এই আইনটির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি। সেজন্য অসুবিধে হচ্ছে। তথ্য পেতে হয়রান হতে হচ্ছে। এজন্য কয়েকটি রাজ্যে কিছু অফিসারের জরিমানাও হয়েছে। তাই বলছি দুর্নীতি রোধে সাধারণ মানুষের হাতে একটি শক্তিশালি হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে এই আইন।

সরকারি কাজে গোপনীয়তার কিছু নেই। সবাই সব কিছু জানার বা বুঝে নেওয়ার অধিকারি। এই স্পিরিটটাকে পঞ্চায়েতের কাজ-কর্মে কাজে লাগাতে হবে। গ্রাম সভায় এই ব্যাপারে সহমত গড়ে তুলতে হবে। তাহলে সত্যি -মিথ্যা যাই হোক গ্রাম জীবনে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে লোকমনে সর্বদাই যে একটা অবিশ্বাস এবং চাপা অসন্তোষের ভাব থাকে তার অবসান হবে। পঞ্চায়েতের আয়ব্যয়ের হিসেব, কী কী কাজ হবে বা হল, কারা কারা কাজে নিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত, কে কত মজুরি পেল সব লিখে প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। এই নিয়ে অযথা ধোঁয়াশা বা সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। কেউ ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হলে সবাই সে খবর জানতে পারবে। সেই মত সংশোধনের দাবী করতে পারবে।

তথ্য টাঙিয়ে দেবার প্রথা কিন্তু ইতিমধ্যেই বহু কেন্দ্রীয় সংস্থায় চালু হয়ে গেছে। সংস্থার ওয়েবসাইট ঘাঁটলেই সেটা দেখা যায়। সংস্থার কর্মীরা কে কী পোষ্টে কাজ করে, কে কত মাইনে পায় সে তথ্য অবধি দেওয়া থাকছে। গোটা দেশের যেকেউই যেকোনো সময় বাড়ি বসেই সংস্থার ওয়েবসাইট খুলে সেসব তথ্য দেখে নিতে পারে। ফলে সরকারি দপ্তরের কোনো কাগজপত্রই গোপন দলিল নয়।

রোজগার প্রকল্পের নানান স্তরে দুর্নীতি, চুরি ইত্যাদি ঠেকানর ব্যাপারে এই আইনটিকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। এমন যে একটা সুযোগ আছে সে ব্যাপারটাই এখনও সবাই জানে না। সেটাই এখন সবাইকে জানানর উদ্যোগ নিতে হবে। এই নিয়ে প্রচার চালাতে হবে। সংক্ষিপ্ত আকারে আইনের কপি লোকের হাতে হাতে ছড়িয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। রাজ্যে রাজ্যে কীভাবে সাধারণ মানুষ এই আইনের সাহায্য নিচ্ছেন সেই দৃষ্টান্তও তুলে ধরা যায়। তবেই লোকের মনে এর সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং আইনটি

ব্যবহারের ব্যাপারে উৎসাহী হবে।

গ্রামসভা কার্যকর হওয়ার পরিস্থিতি আছে কী

অভিজ্ঞ লোকেরা বলবেন এই রাজ্যে ওই প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের পরিস্থিতিই নেই। গ্রামের মাতব্বরদের দুর্নীতি আর দলবাজী আজ ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে গঞ্জে। প্রথম সাহস দেখিয়েছিল কলকাতার অদূরে অবস্থিত সিঙ্গুরের মানুষ। টাটার মোটর গাড়ির কারখানার জন্য জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে। পরে সেই সাহস ছড়িয়ে পড়ে নন্দীগ্রামে। সেখানে কেমিক্যাল হাবের জন্য জমি দখলের নোটিশ টাঙানর সাথে সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলে মানুষ। সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। সি পি এম-এর ক্যাডার বাহিনী খুন-খারাপি ও সন্ত্রাস চালিয়ে এর বদলা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ভয় ভীতি সন্ত্রাসের মধ্যে দাঁড়িয়েও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মানুষ নিঃশব্দে তার জবাব দিয়েছে ভোটের বাক্সে। ক্ষমতাদর্পী সিপিএম পার্টির পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নিয়েছে নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত মানুষ। অল্প কিছুদিন আগেও সিপিএম-এর অতি বড় শত্রুও এই পরিণতির কথা ভাবতেও পারত না। কিন্তু ঘটেছে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পথ দেখিয়েছে। এবার জেগে উঠেছে আদিবাসী সাঁওতাল শবর লোধা ইত্যাদি গোষ্ঠীর মানুষ। শালবনী-বিস্ফোরণ কান্ডের পর মাওবাদী ধরার নামে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষদের ওপর পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ। বিক্ষোভ আন্দোলন লালগড়, বীনপুর, শালবনি, ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে আরও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তা কেটে ফেলে পুলিশ ও প্রশাসনের গ্রামে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দেয় তারা। ঘটনার আকস্মিকতায় পুলিশ, প্রশাসন ও সিপিএম পার্টির বিমূঢ় অবস্থা। নন্দীগ্রামের মত এখানেও মোটর-সাইকেলবাহী বন্দুকধারী পার্টি-ক্যাডারদের লেলিয়ে দেবার সাহস হচ্ছে না আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তাদের। মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভায় বলতে হয়েছে আদিবাসী মহিলাদের ওপর পুলিশী হামলার জন্য তিনি লজ্জিত!

এক বছর আগেও এই রাজ্যের কেউ কল্পনাও করতে পারতো না এই পরিস্থিতি। বন্দুক না উঁচিয়ে কথা বলে না যে পুলিশ ও প্রশাসন, তারা প্রায় যেকোনো শর্তে আন্দোলনকারিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসায় রাজি আজ। তাই বলছিলাম পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। আগামী দিনগুলি আর আগের মত নাও থাকতে পারে। মানুষ সঙঘবদ্ধ হলে এবং চাইলে পঞ্চায়েত ও গ্রামসভার কাজকর্মের পদ্ধতি বদলে দিতে পারে। সেই লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে।

পৌঁছতে হবে এদের কাছে

এখন প্রশ্ন কে বা কারা এইসব তথ্য পৌঁছে দেবে মানুষের কাছে? রোজগার-প্রকল্পের বিষয় এবং তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আইনের খুঁটিনাটি বিষয়। জেলার পত্র-পত্রিকাগুলি প্রাথমিকভাবে প্রচারের কাজটা করতে পারে। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা জনকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও প্রচারের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। আর পারে রাজনৈতিক কর্মীরা। যারা গ্রামে গঞ্জে মানুষের কাছাকাছি অবস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। বিগত দুক্সবছরের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যের বেশিরভাগ পঞ্চায়েত এই প্রকল্প কার্যকর করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় নি। গত বছর পশ্চিমবঙ্গে গড়ে পরিবার পিছু মাত্র ১৮ দিন কাজ পেয়েছিল। ফলে বরাদ্দ অর্থের বেশির ভাগই ফেরৎ গেছে। অথচ কাজ না জোটাতে পেরে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কেটেছে এই রাজ্যের বহু মানুষের! দৈনিক পত্রিকায় তার খবর আমরা দেখেছি। অথচ অনায়াসে কিছু কাজ জুটিয়ে দিয়ে এদের জন্য কিছু রোজগারের বন্দোবস্ত করা যেত। টাকার অভাব ছিল না। যে লালগড়ে মানুষকে আজ পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে দেখা যাচ্ছে সেটা নিছক পুলিশের বিরুদ্ধেই জেহাদ এমন মনে করার কারণ নেই। ক্রমাগত বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার সেখানকার মানুষ। এদের একটি জীবিকা হল শালপাতার থালা বানান। দিনে রোজগার কুড়ি-পঁচিশ টাকার মত। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এখানকার মানুষ রোজগার যোজনায় কাজ পেয়েছে গড়ে মাত্র চার থেকে পাঁচ দিন এবং সেই কাজের জন্য মজুরি পেয়েছে দৈনিক মাত্র ত্রিশ টাকার মত! অথচ সত্তর থেকে আশি টাকা পাওয়ার কথা তাদের। বাকি টাকা উবে গেছে।

পঞ্চায়েতের এই দুর্নীতি ও অপকীর্তির কথা মানুষকে জানানই একটা বড় কাজ। তাহলে ন্যায্য মজুরিতে কাজের দাবীতে গড়ে উঠতে পারে আন্দোলন।

সরকারি প্রকল্প ব্যবহারের পক্ষে কথা বলা মানেই স্থিতাবস্থার পক্ষে দাঁড়ানো নয়

সরকারি প্রকল্পের সপক্ষে সওয়াল করায় অনেকের অনীহা থাকবে। বিশেষ করে বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী লোকেদের। তাদের কাছে এটা রিফরমিস্ট কাজ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যিই তাই কিনা ভেবে দেখতে অনুরোধ করব। প্রকল্পটা সরকারের ঠিকই। কিন্তু কাজের দাবী তো অধিকার আদায়ের দাবী। রাজনৈতিক কর্মীরা তো এমন দাবী আদায়ের জন্যই লড়াই করে। নিছক সমাজ বদলের দাবী নিয়ে তো আর আন্দোলন হয় না। শুধু এজন্যই আন্দোলনে সামিল হয় কারা বা কজন? মানুষ তার নিজের পাওনা দাবীদাওয়া আদায়ের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই আন্দোলনে সামিল হয়। তা না হলে সমাজ বদলের দাবীর মত বিমূর্ত ধারণায় পৌঁছবে কীভাবে মানুষ? তবু যারা পৌঁছন, তারা মাথা খাটিয়ে পৌঁছন। যেমন পেশাদার রাজনীতিকরা। রিফরমিস্ট দাবি আদায়ের জন্যই আন্দোলনটা সাজায়, খুব বেশি হলে ভোটে জেতা পর্যন্ত ভাবে। সেই একই দাবি নিয়ে যখন বামপন্থীরা আন্দোলন করে তখন তারা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সমাজ বদলের চেতনায় মানুষকে উন্নীত করার চেষ্টায় সতত ব্রতী এবং সক্রিয় তার উপযুক্ত সংগঠনের সন্ধান ও নির্মাণে।

রোজগার যোজনার কর্মসূচি কার্যকর করার দাবীর মধ্য দিয়ে আগামীদিনের উপযোগী রাজনীতির জন্ম হতে পারে। যে রাজনীতির লক্ষ্য হবে নীচের তলার মানুষের ক্ষমতায়ণ। কাজের অধিকার অর্জনের পথে বাধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই হোক সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক কর্মের শিক্ষা। এই রাজনীতিতে যে দল অংশ নিতে চাইবে তাকে মনোভাব বদলাতে হবে। তাদের বলতে হবে যে তারা মানুষের আন্দোলনের পেছনে আছে। জনগণ তাদের পেছনে আছে বলার অভ্যাস ছাড়তে হবে। মানুষকে তার অতীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার সহায়তা দেবার মনোভাবই হোক আগামী দিনের রাজনীতির স্পিরিট।

বর্তমানের রোজগার আইনটি যথেষ্ট নয়, এর সংশোধন চাই

বর্তমানের এই রোজগার প্রকল্প বিষয়ের আইনটি যথেষ্ট নয়। এর সংশোধন চাইতে হবে। যেমন একক্সশ দিন নয়, দাবী তুলতে হবে সারা বছরের জন্য কাজের নিশ্চয়তা চাই। আর কেনইবা এই প্রকল্প কেবল গ্রামের দরিদ্রদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে? শহরময় ছড়িয়ে আছে অজস্র হাতে কাজ না থাকা দরিদ্র মানুষ। এদেরও ৭৪ নং সংশোধনী মারফৎ এই প্রকল্পের আওতায় আনার দাবী তুলতে হবে। আবার দারিদ্র সীমার নীচের মানুষেরাই রোজগার যোজনার কাজ পেতে পারবে এই বিধিটিরও পরিবর্তন চাইতে হবে। যে চাইবে তাকেই কেন কাজ দেওয়া হবে না? অন্যত্র কাজ না পেলেই তো লোকে কাজ চাইতে আসবে। সরকার নির্দ্ধারিত দারিদ্র সীমার ভিত্তি ও নথিকরণ নিয়েই বিস্তর প্রশ্ন আছে। ফলে ওই নিয়ে ফ্যাঁকড়া রাখার দরকারটা কী?

With best compliments from

FABURN INDUSTRIES

Engineer's & Fabricators.
11B, Umakanta Sen Lane
Paikpara, Kolkata-700 030
E-mail: fabfurn.industries@gmail.com
fabfurn.industries@yahoo.com
Phone: 2556 8447
Mob: 9831642971, 9836441195
Fax: (033) 2532 9551

আমাদের ঐতিহ্যে পরিবেশ

সুভাষ গাঙ্গুলী

প্রাচীন ভারত (বলা বাহুল্য সিন্ধু সভ্যতা পরবর্তী ভারত) সম্পর্কিত যা কিছু ঐতিহ্য তা যেভাবে শিবির বা দল বিশেষের প্রায় কুক্ষিগত সম্পত্তি হিসেবে গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে (যদিও এদের ঘোষিত বা অনুসৃত কর্মকান্ড এই ঐতিহ্যের গভীরতম ও আলোকজ্জ্বল অংশগুলির - যেমন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আত্মীয় জ্ঞান করা , পরিবেশ - সম্পূর্ণ বিপরীত) এবং অন্যরাও যেভাবে তাদের 'আধুনিক' স্ব-পরিচয় প্রতিষ্ঠার খাতিরে সে সম্পর্কে প্রায় নীরবতার মধ্য দিয়ে (ইংরেজীতে যাকে বলা চলে অনেকটা যেন by default) সেটা কার্যত মেনে নিচ্ছেন তাতে 'প্রাচীন ভারত' -এর কোন আলোকজ্জ্বল দিক-এর উল্লেখ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে 'আধুনিকতার' লোভ-বন্দনা-মুখর (celebration of greed with gusto) দিকের উল্লেখ খানিকটা ভয়ে ভয়েই করতে হয় । তা সেই আশঙ্কা দুরু দুরু বক্ষেই অধুনা এক অতি চর্চিত বিষয় (বি-ও-বি-তেও যার উপর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে) প্রসঙ্গে আমরা সংক্ষেপে সেই তুলনাতে যাচ্ছি।

বিষয়টা পরিবেশ। আর এই মুহূর্ত্তে এই তুলনার উপকরণ সংগৃহীত বাংলা সাহিত্যে প্রায় প্রকৃতি-পূজারী হিসেবে সুপরিচিত দুই ব্যাক্তির - রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ (বন্দ্যো ঃ) - রচনা থেকে। আজ থেকে ৯৯ বছর আগে রচিত 'তপোবন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, কাব্য ও তখন পর্যন্ত জানা ইতিহাসের ভিত্তিতে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে নিছক 'তপোবন'-এর যুগ শেষ হয়ে নগর সভ্যতার আত্মপ্রকাশের পরও অরণ্য ও অরণ্য-জীবনের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধা বহু শতাব্দী জোড়া সুপরিচিত প্রাচীন ভারতীয় কাব্য ও মহাকাব্যে বারে বারে এসেছে। নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস নয়, অরণ্য ও অরণ্য-জীবন রক্ষা তৎকালীন সামাজিক তথা রাজশক্তির অবশ্য করণীয় কাজের অংশ ছিল। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বনের প্রতি আমেরিকা ও পুরোন ভারতীয় নগর সভ্যতার মনোভাবের তুলনা করে বলেছেন :

> ''আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের সৃষ্টি হয় নি তা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল । অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল।..... নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে, আপনার সঙ্গে যুক্ত করে নি, তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি।''

তার আগে আর এক জায়গায় বলেছেন :

> ''প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভুত করে নি, বরং তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্য নিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে।''

আর এক জায়গায় :

> ''মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট।''

এবার বিভূতিভূষনের 'অপরাজিত' উপন্যাসের মূল চরিত্র অপুর প্রাপ্ত বয়েসের কোন এক সময়ে চিন্তার স্রোতের একটুখানি নমুনা। সম্ভাব্য এক ''তামার খনির জন্য প্রসপেক্টিং'' -এর কাজে এক অরণ্যা'লে কাজ করে ''সেই ধূলা, ধোঁয়া, গোলমাল, একঘেয়েমি, সঙ্কীর্ণতা'' ভরা কলকাতায় ফিরে আসার পর তার মনে পড়ছে :

> ''সেখানকার সেই বিরাট রুক্ষ আরণ্যভুমি, নক্ষত্রলোকিত আলো-আঁধার, উদার জনহীন বিশাল তৃণভুমি.....সেই অবাধ জ্যোৎস্না,

স্বাধীনতা, প্রসারতা, সেই বিরাট নির্জনতা তাহাকে আবার ডাকিতেছে। এক এক সময় তাহার মনে হয় কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যান্ডে, আফ্রিকায় মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করিতেছে.....ওর শুশুক, পাখি, শিল, বল্গা হরিণ, ভালুককে খুন করিয়াছে.-তেল, ব্যবসা, চামড়ার লোভে ওর মহিমময় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠের কারখানা খুলিয়াছে, এ সবের প্রতিশোধ একদিন আসিবে।''

সেই ''প্রতিশোধ'' আজ কত ভাবে ও রূপে আসছে তারই ভয়াবহ কাহিনী রোজই এখন সোরগোল তুলছে। বিভূতিভূষণের আর এক উপন্যাস 'আরণ্যক' যে চরিত্রের আত্মকথা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে তার শুরু এ-রকম:

''মহালিখারূপের পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল বনপ্রান্তরে বসন্ত নামিয়াছে, লবটুলিয়া বইহারের সর্ব্বত্র হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা,..... ইহাদের কথাই বলিব।..... কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভুমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল,..... নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।"

উপন্যাসের শেষে আবারও সেই একই অনুশোচনার বার্ত্তা :

''বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের সে অপূর্ব্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে।''

সংশ্লিষ্ট রচনাগুলিতে আরও অনেক কিছু মিলিয়ে লেখকদের যে সামগ্রিক জীবন-দর্শন আত্মপ্রকাশ করেছে তার উপরে কোন মতামত দেওয়ার কোনরকম চেষ্টা এখানে করা হচ্ছে না। এই উদ্ধৃতিগুলির উল্লেখের কারণ এটুকুই যে পরিবেশ ধ্বংসী 'উন্নয়নের' নম্র ও একই সাথে কঠোর সমালোচনার এই স্বদেশী ঐতিহ্য আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে আমাদের নিজেদের ('ডান' -'বাম' ও তার বাইরে সবার কথাই হচ্ছে) সোচ্চার হুঁশ আসার অনেক আগেই আমাদের কাছাকাছি পূর্ব্বসূরিদের অনেকের চোখেই এই ভয়াবহ পরিণতি'র সম্ভাবনা চোখে পড়েছিল এবং পরিবেশ সচেতনতা এদেশের প্রাচীনতর ঐতিহ্যের অনুসারী।

অতীত মানেই 'অন্ধকার অতীত' এমন ব্যাখ্যা অজ্ঞতা/অসচেতনতা বা উন্মাদনা (উপরোক্ত অন্য শিবিরের প্রাচীনত্বের নামে উন্মাদনার বিপরীতে) প্রসূত সরলীকরণের নামান্তর, যা অনেক সময় নানা কিসিমের 'আধুনিকতা' বা 'প্রগতিশিলতা'র নামে চলে থাকে। আর আমাদের গর্বের 'আধুনিক' কাল সহ সব যুগই যে আলো-আঁধারের সংমিশ্রন এই জানা কথাটা না ভোলা ভাল। আজকের পরিবেশ আন্দোলনকে যদি এই প্রায় বিস্মৃত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় অনুভব/মূল্যায়ন করতে পারি আমরা তবে তার কার্যকারিতা বাড়বে বই কমবে না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বন্ধু রবীন মজুমদার (দুটি প্রয়োজনীয় সংযোজন মনে করিয়ে দেওয়া ও রচনার শিরোনামা প্রদানের জন্য।)

''পরিবেশ ২০০৯''

ভূ-উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন শুধু বিশ্বের নয়, আমাদেরও বিচলিত হবার বিষয়। এই নিয়ে শিক্ষা ও অন্যান্য নানা পেশার মানুষদের যৌথ প্রয়াস ঃ পরিবেশ ২০০৯। ফেব্রুয়ারী ২০-২১ (শনি-রবি) কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত পোষ্টার, মৌলিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা প্যানেল আলোচনা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদিতে আপনিও আসুন।

Space Donated by

A WELL WISHER

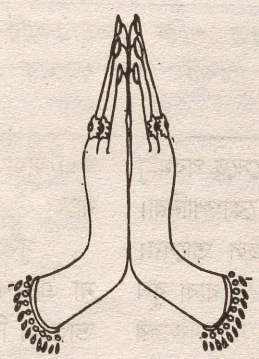

নতুন শক্তি : নতুন সমাজ?

শুভব্রত নিয়োগী

পৃথিবীর ফসিল ফুয়েল যে শেষ হয়ে আসছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আমেরিকা আর ইওরোপের দেশগুলোর সাম্প্রতিক শক্তি নীতিতে সেই ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ছে। ২০০৮ সালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে আমেরিকা তার উৎপাদিত গমের ৯ শতাংশ, ভুট্টার ২৫ শতাংশ আর ধানের ১৫ শতাংশ ব্যবহার করছে জৈব জ্বালানী (প্রধানত ইথানল) তৈরীর কাজে। মিডিয়া উইথ কনসেইন্স জানাচ্ছে, ইংল্যান্ড আগামী ১২ বছরে তার প্রয়োজনীয় পেট্রোলের ১৩ শতাংশ উৎপাদন করতে চায় উদ্ভিদ থেকে। এর জন্য ভরতুকি দিতেও সে প্রস্তুত। ব্রাজিল ইথানল উৎপাদনে পৃথিবীতে অগ্রগণ্য দেশ। খাদ্য শস্য গাঁজিয়ে ইথানল বানানোয় প্রবল আপত্তি উঠেছিল দেশ জুড়ে। এ বছর মে মাসে সরকার ঘোষণা করেছে ইথাইল অ্যালকোহল উৎপাদন কমানোর প্রশ্ন নেই। তবে শুধু মাত্র আখ থেকে তা করা হবে, খাদ্যশস্যে হাত দেওয়া হবে না। উল্লেখ্য, ব্রাজিলের ইথানলের প্রধান গ্রাহক আমেরিকা। ব্রাজিলের ন্যাশনাল সাপ্লাই কোম্পানি জানিয়েছে ২০০৮ সালে ২৭০০ কোটি লিটার ইথানল উৎপাদন করা হবে, যা গত বছরের হারের ২০ শতাংশ বেশী। এছাড়া বায়ো-ডিজেল হিসেবে জ্যাট্রোপা, সয়াবিন চাষ শুরু হয়েছে বিভিন্ন দেশে।

কেউ প্রশ্ন তুলছে না, সত্যি এত শক্তি ব্যবহার করাটা কি খুব জরুরি? এত এত শক্তি ব্যবহারকারি জীবনযাপনের ব্যবস্থাটা কি খুব যুক্তিসঙ্গত? শুধুই কি বিদ্যুতের সংকট? সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডারও তো শেষ হয়ে আসছে।

শক্তি সংকটের আঁচ পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে পরমাণু চুল্লি আর জ্বালানী উৎপাদন ও সরবরাহকারি কোম্পানিরা। এত দিন প্রায় মাছি মারার অবস্থা হয়েছিল তাদের। এবার বোধহয় তার মরা গাঙে বান এল, জয় বাবা বুশ বলে তরী ভাসানোও হলো। ওবামা হাওয়া কী চরিত্রের হয়, সেটাই এখন বড় চিন্তার বিষয়!

অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিও কিন্তু ওয়েদার ক্লক হিসাবে এ সময় বেশ উপযোগী ভূমিকা পালন করছে। তেলের ভাঁড়ার যে ঢুঁ ঢুঁ সেটা টের পেয়েই বোধহয় বড় বড় গাড়ি উৎপাদক কোম্পানিরা আগে ভাগে কেটে পড়েছে। এই টেকনোলজি দিয়েই আরও কিছুদিন অন্তত ব্যবসা চলতে পারে এই আন্দাজের ভিত্তিতে 'পুব দিকে চলো' নীতি নিয়ে এশিয়ার দেশেগুলোয় চলে এসেছিল। কিন্তু বিধি বাম। দুনিয়া জুড়ে মন্দার জেরে গাড়ির বাজার পড়ে গেছে। সব কোম্পানীকেই গাড়ি উৎপাদন কমাতে হচ্ছে। তাদের ভীড়ে টাটার অশোক লেল্যান্ডও আছে। এর ওপর যদি ন্যানো যোগ হতো তাহলে টাটার দুর্ভোগ আরও বাড়তো।

- দুই -

পৃথিবীর যা কিছু সম্পদ তার প্রধান ভোক্তা হলো বড়লোক দেশের মানুষরা। গরীব দেশের স্বল্প সংখ্যক ধনীরাও তার অংশীদার। আর মধ্যবিত্ত জনগণ কবে সেই ভোগের অংশীদার হবে সেই স্বপ্নে বিভোর (আর সেই স্বপ্ন নিয়েই তো ব্যবসা)। অমন সুখের স্বপ্নে ব্যাঘাত হলে বড়ই ক্ষিপ্ত হন তাঁরা। এখন জুটছে না তো কি হল? কোনো দিন তো জুটতেও পারে। শুধু সুখ নয়, আরও একটা অজুহাত আছে। যত সব ভোগের সামগ্রী সেগুলি আবার বিজ্ঞানের ফসল। বিজ্ঞানের বিরোধিতা কি করা যায়? করলে সে তো চরম অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার হয়ে যাবে!

সুতরাং ভোগের পুজো চলতেই থাকবে, যতক্ষণ না একেবারে নিঃস্ব হচ্ছে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার। বিজ্ঞানের এই রমরমার বাজারে আজও পৃথিবীর দুশো কোটি মানুষের কপালে বিজ্ঞানের ন্যূনতম ফসল যেমন বিদ্যুৎ বা পেট্রল বা জ্বালানী গ্যাসের ছিটেফোঁটাও

জোটেনি। তাদের প্রতি পরিবারে যদি ২০০ ওয়াট শক্তিও রোজ দিতে হয়, তাহলেই আমাদের সুখের বাগান শুকিয়ে যাবে। প্রচলিত শক্তির উৎসের (প্রধানত খনিজ তেল ও গ্যাস) বেশির ভাগটাই যাচ্ছে গুটি কয়েক দেশের ভোগে। যারা ওই ভোগের স্বপ্নে বিভোর তারা ভেবেও দেখছেন না দুনিয়ার সবার জন্য এমন ভোগের জোগান দেওয়া সম্ভবই না। আসুন দেখা যাক মাথা পিছু শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী বৈষম্যের ছবিটা।

সে সব হবার নয়। আর্ন্তজাতিক রাজনীতি আছে কি করতে ?

ই এফ সুমাকার -তাঁর বিতর্কিত বই স্মল ইজ বিউটিফুল (১৯৭৩)-এ দেখিয়েছেন আমেরিকা পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ৫.৬ ভাগ বহন করে। অথচ পৃথিবীর ৪০ শতাংশ প্রাথমিক সম্পদ তার ভোগে যাচ্ছে, সে দেশের প্রচলিত ব্যবস্থাটা টিকিয়ে রাখতে। এ প্রসঙ্গে সুমাকারের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যায় -*দি মোস্ট*

সারণী -বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু শক্তি ভোগ (Energy Consumption)
মিলিয়ন বি টি ইউ হিসাবে (দশমিক স্থান বাদ দিয়ে)

	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২	২০০১	২০০০	১৯৯৯	১৯৯৮	১৯৯৭	১৯৯৬	১৯৯৫
ইউ এস এ	৩৪০	৩৪২	৩৩৮	৩৪০	৩৩৮	৩৫০	৩৪৬	৩৪৪	৩৪৭	৩৪৯	৩৪২
ব্রাজিল	৫৩	৫২	৫০	৪৯	৫২	৪০	৩০	৩০	৩১	২০	২৩
কিউবা	৪০	৪০	৪১	৪১	৪১	৪১	৪১	৪০	৪৩	৩৯	৩৮
ডেনমার্ক	১৫৩	১৫৯	১৬৫	১৫৮	১৬৫	১৬৩	১৬৭	১৭৩	১৭৮	১৮৫	১৬৮
ইতালি	১৩৮	১৩৮	১৩৭	১৩২	১৩২	১৩২	১৩১	১২৯	১২৫	১২৩	১২৩
রাশিয়া	২১২	২০৩	২০৮	২০১	১৯৪	১৯১	১৮৮	১৮৪	১৭৭	১৭৫	১৯০
ইরাক	৪৭	৪৪	৪১	৪৭	৪৮	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫৫	৫৭
ইউএই	৫৬৩	৫৬৭	৫৬৪	৫৭৭	৫৫৮	৫৭৯	৬১০	৬৩৪	৬৪৪	৬৪১	৬৫৩
সিএআর*	১. ৩	১. ১	১. ৪	১. ৪	১. ৪	১. ৪	১. ৪	১. ৩	১. ৩	১. ৪	১. ৪
আফগান	০.৬	০.৬	০.৭	০.৮	০.৭	১. ০	১. ১	১. ১	১. ১	১. ২	১. ৩
ভারত	১৪	১৪	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১২	১২	১১	১২
চিন	৫১	৪৬	৩৯	৩৩	৩০	২৯	২৯	২৯	৩০	২৯	২৮
জাপান	১৭৭	১৭৮	১৭৩	১৭২	১৭৪	১৭৫	১৭২	১৬৮	১৭১	১৬৭	১৬৪
অস্ট্রেলিা	২৭৩	২৬১	২৬০	২৬২	২৫৯	২৫৩	২৫৪	২৪৪	২৪৫	২৩০	২২৩

* সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক

ওপরের সারণী থেকেই বোঝা যাচ্ছে দেশে দেশে শক্তি উপভোগের ফারাকটা কত বিশাল। ভারত যদি চিন বা ব্রাজিলের মতো, আর চিন যদি ডেনমার্ক বা ইতালির মতো মাথাপিছু শক্তির জোগান চায়, তাহলেই সঁিত খনিজ জ্বালানি শেষ হতে এক দশকও লাগবে না। অথবা আফ্রিকার দেশ গুলো বা আফগানিস্থান যদি চায় অন্তত ভারতের মতো হতে তাহলেও বড়লোক দেশগুলোর বিলাস ব্যাসনে কাটানোর দিন শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং

স্ট্রাইকিং থিং অ্যাবাউট মর্ডান ইনডাস্ট্রি ইজ দ্যাট ইট রিকোয়ার্স সো মাচ অ্যান্ড অ্যাকমপ্লিসেস সো লিটল। মর্ডান ইনডাস্ট্রি সিমস টু বি ইনএফিসিয়েন্ট টু আ ডিগ্রি দ্যাট সারপাসেস ওয়ানস অর্ডিনারি পাওয়ারস অফ ইমাজিনেশন। ইটস ইনএফিসিয়েন্সি দেয়ারফোর রিমেন্স আননোটিশড। কিছু মানুষের জন্য সুখ ও ভোগের ব্যবস্থা করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার অবলীলায় ধ্বংস করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ প্রকৃতির ভারসাম্যটাই বিপর্যস্ত।

। তিন ।

এতদিন বিকল্প শক্তি নিয়ে গবেষণা ছিল তাত্বিক স্তরে-সৌখীন পর্যায়ে। সরকারি মদত প্রায় ছিলই না। পারমাণবিক শক্তির শত ঝঞ্ঝাট সত্বেও অফুরন্ত বিনিয়োগ হয়েছে সেই প্রযুক্তিতে। বোমার মশলা বানাতে ঐ প্রযুক্তি যত কাজ দেখিয়েছে সে তুলনায় শক্তি সমস্যার সমাধানে সাফল্য দেখাতে পেরেছে অল্পই।

এবার কিন্তু সত্যি শক্তির বিকল্প উৎস দরকার। দরকার এই ভোগবাদী সমাজব্যবস্থা কায়েম রাখতে ও আরো পরিবর্ধিত করতেই। কারণ প্রচলিত শক্তির উৎস সত্যিই শুকিয়ে আসছে। সুতরাং এমত অবস্থায় বায়ু, সৌর, জৈব শক্তি বিষয়ের প্রযুক্তি কিছুটা মদত পেতে শুরু করেছে। সম্প্রতি (অক্টোবর ২০০৮) আমেরিকান কংগ্রেস আইন সংশোধন করে ঘোষণা করেছে, বাড়ি বা বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সৌর শক্তি ব্যবহার করলে প্রদেয় করে ৩০ শতাংশ সুবিধা (Tax Credit) পাওয়া যাবে ।

বর্তমান ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল শক্তি, এইসব প্রযুক্তির মিলিত প্রয়াসও যথেষ্ট কিনা, তা এখনো বিরাট প্রশ্ন। মজার ব্যাপার এই সব প্রযুক্তির প্রবক্তাদের স্ব স্ব প্রযুক্তির কার্যকারিতার গুনগানে মুখর হতে শোনা যাচ্ছে। যেন তাদের শক্তি-প্রযুক্তি একাই শক্তির জোগান দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ইওরোপিয়ান উইন্ড এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করেছে ২০২০ সালে পৃথিবীর যত বিদ্যুৎ দরকার (ক্রমবর্ধমান হারে), তার দ্বিগুণ পরিমাণ বিদ্যুৎ বায়ু-শক্তি দিতে পারবে। সৌর বিদ্যুতের প্রবক্তারা বলছেন, ফোটো ভোল্টাইক সেল তো আছেই, কনসেনট্রেটেড সোলার পাওয়ার বা CSP প্রযুক্তি দিয়ে মরু অ'লে প্লান্ট বসিয়ে পৃথিবীর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। এছাড়াও জল বিদ্যুৎ, বায়ো -ফুয়েল, বায়ো-ডিজেল, বায়ো মাস, সমুদ্রের ঢেউ, সব যদি একত্রে কাজে লাগান যায় তাহলে শক্তি নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।

কেউ প্রশ্ন তুলছে না, সত্যি এত শক্তি ব্যবহার করাটা কি খুব জরুরি? এত এত শক্তি ব্যবহারকারি জীবনযাপনের ব্যবস্থাটা কি খুব যুক্তিসঙ্গত? শুধুই কি বিদ্যুতের সংকট? সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডারও তো শেষ হয়ে আসছে। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের এই বিপুল কান্ড কারখানা চালাতে যে সব খনিজ পদার্থ লাগে, তাদের জোগানও যে শেষ হয়ে আসছে -এই সহজ সত্যটা আজ কেউ স্মরণ করতে চাইছে না। এমনো শোনা যাচ্ছে, চাঁদ থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ আনা হবে। এই ব্যবস্থার পরিচালকরা বিজ্ঞানের গরু চাঁদে তুলে ছেড়েছে। এর শেষ কোথায় কে জানে!

। চার ।

পৃথিবীকে যদি আরো হাজার হাজার বছর প্রাণী ও উদ্ভিদের বাসযোগ্য রাখতে হয় তাহলে এই বিপুল শক্তিভোগী এবং সম্পদ ব্যবহারকারী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতেই হবে। যেহেতু প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থক ও পরিচালকরাই বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্তা আর প্রবল শক্তিধর, তাই সাসটিনেবল ডেভলপমেন্টের বা পরিবেশ আন্দোলনের সমর্থকরা যতই যুক্তি দিন, আন্দোলন করুন দেশে দেশ এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা সহজ নয়। বর্তমানে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে - যদি শক্তি ও সম্পদের জোগান ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসে। প্রাকৃতিক সম্পদ ভান্ডরের দৈন্য Limiting Factor হয়ে এই ব্যবস্থাকে থামিয়ে দেয় আর এইভাবে প্রকৃতি নিজেকে বাঁচায়।

সে দিক থেকে দেখলে শক্তি সংকটকে বিপদের বদলে এক নতুন যুগের সম্ভাবনা হিসাবেও দেখা যেতে পারে। অনেক কম শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করে, জীবন যাপনের অপ্রয়োজনীয় গতিময়তা পরিহার করে আর ইকোসিস্টেমের সাম'স্য বজায় রেখে, এক সম্মৃদ্ধ মানব সমাজ গঠন সম্ভব হতে পারে। সাসটেনেবল ডেভলপমেন্টের প্রচারকরা বনে ফিরে যাবার কথা বলেন না। গৌতম বুদ্ধ বা ইভান ইলিচ পাগল ছিলেন না। চরম ভোগবাদ অথবা চরম কৃচ্ছসাধন কোনটাই জীবনের উপযোগী পথ নয় -ব্যক্তি বা সমাজ, উভয় ক্ষেত্রেই এটা সত্য। শক্তির সব উৎস শেষ হয়ে যাচ্ছে না। তিন চার শ বছর আগে যতটা শক্তি মানুষ ব্যবহারের জন্য পেত, তার চাইতে অনেক বেশি শক্তির জোগান বোধহয় নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে পাওয়া সম্ভব হবে। সেই শক্তির সমবন্টন যদি হয় ,তাহলে পৃথিবীর সব মানুষ অনেক ভালভাবে বাঁচতে পারে। কিন্তু অফুরন্ত শক্তি বা সম্পদের জোগান সম্ভব নয় - কোনোদিন তা ছিলও না। গান্ধিজির সেই বিখ্যাত উক্তি আবার স্মরণ করা যেতে পারে- *পৃথিবীতে সকলের প্রযোজন মেটানোর মত যথেষ্ট আছে, কিন্তু সবার লালসা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট নেই।*

ভারতের পারমানবিক উদ্যোগ - ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০

প্রদীপ দত্ত

স্বাধীনতার আগে বিজ্ঞান গবেষণা মূলত ব্যক্তির আগ্রহের ওপর নির্ভর করতো। অর্থের যোগান ছিল অল্প, গবেষণা ছিল খোলামেলা। এই অবস্থাতেও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট অবদান ছিল। ১৯৩০ সালে সি ভি রমন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে পরমাণু গবেষণার কাজে কোলকাতায় সাইক্লোট্রন যন্ত্র বসিয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের দৌলতেই এইসব বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। অথচ আজ ভারতীয় বিজ্ঞান এত বেশি পারমাণবিক, সামরিক ও মহাকাশ গবেষণার দিকে ঝুঁকে রয়েছে যে বিজ্ঞান জগৎ এবং অপামর ভারতীয়ের জন্য তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না।

দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে পরমাণু শক্তি এবং মহাকাশ গবেষণা ভোটের সময় ইমেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ১৯৭৪ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উত্তর প্রদেশের নারোরায় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। সরকারের পরিবেশ বিভাগ অঞ্চলটির নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিকূল রিপোর্ট পেশ করেছিল কিন্তু আসন্ন ভোটের কথা ভেবেই ইন্দিরা গান্ধী সেই রিপোর্ট মানেন নি। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিল উন্নয়নের প্রতীক।

পরমাণুর বিভাজন আবিস্কারের পর যে বিপুল কর্মযজ্ঞের ফলে বোমা উৎপাদিত হয়েছিল তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেল বন্ধন ঘটায়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রথম দশকে, ১৯৪৮ থেকে '৫৮ সালের মধ্যে নানা দেশ তা আয়ত্ব করতে উঠেপড়ে লেগেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উন্নত দেশের শিল্প ও প্রযুক্তিতে যে ভিত গড়ে উঠেছিল তার ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকটি দেশে পরমাণু প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতি ঘটে। সে সময় দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতীয় নেতৃত্ব দেশ গড়ার কাজে মন দিয়েছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের সময় পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের অংশগ্রহন সম্ভব হয়নি বলে এই নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবস্থা আয়ত্বে আনার কোনও পরিকাঠামোই এদেশে ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানীমহলের মনে হয়েছিল যে পরমাণুকে শান্তির কাজে ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে ওঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেইমত ১৯৪৮ সালের ১০ অগস্ট ভারত সরকার অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন (AEC) গঠন করে। টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবাকে কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২৪শে জানুয়ারি, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভাবা AEC-র চেয়ারম্যান ছিলেন।

স্বাধীনতার আগে জাতীয় কংগ্রেসে নেহেরুর বিজ্ঞান উপদেষ্টা ছিলেন মেঘনাদ সাহা। তিনি বুনিয়াদি বিজ্ঞান গবেষণাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরোধীতা করেছিলেন। স্বাধীন পরমাণু শক্তি সংস্থা গঠনেরও বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহেরু তাঁর প্রাক্তন বিজ্ঞান উপদেষ্টার কথা কানেই তোলেন নি। AEC গঠিত হলে নীতিগত কারণে মেঘনাদ সাহা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হন নি। তাঁর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে ভারতে বিজ্ঞান নীতি গৃহীত হয়।

বৈজ্ঞানিক পরামর্শের ক্ষেত্রে নেহেরু ভাবার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন, সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ। একমাত্র ভাবাই নেহেরুকে 'ভাইক্স সম্বোধন করতেন। নেহেরুর সঙ্গে সুসম্পর্কের সুবাদে ভাবার নেতৃত্বে বিজ্ঞান নীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়াল। বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা জনসাধারণকে কিংবা পার্লামেন্টে বিস্তারিত বলা হতো না। বেসরকারি বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে কোনও সমালোচনা সরকার ভালো চোখে দেখতো না। AEC গঠিত হবার পর বিজ্ঞানের গবেষণা কলকাতা থেকে মুম্বাইয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে নেহেরুর সাথে পরামর্শ করে, ভাবা

এমনভাবে AEC-র পুর্নগঠন করেন যাতে বিজ্ঞান পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা পান। AEC-র চেয়ারম্যানকে যাবতীয় আর্থিক এবং পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একই সাথে ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জির (DAE বা পরমাণু শক্তি বিভাগ) সেক্রেটারি হিসাবে তাঁকেই নিয়োগ করা হয়। তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন। ভাবাকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয় যাতে তিনি কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মতামত অগ্রাহ্য করেও চলতে পারেন। AEC-কে নিজের নীতি ও কর্মপদ্ধতি রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ভাবার নিজের অফিস থেকে প্রেরিত সরকারের এই নোটিশের মাধ্যমে তিনি দেশের সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যেই সার্বিক স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। AEC ও DAE-র সর্বময় কর্তা ছাড়াও তিনি গোড়া থেকেই টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর (TIFR)-র অধিকর্তা ছিলেন। এই সংস্থার বাজেটের শতকরা ৯৯ শতাংশই জোগান দিত DAE। তবে সরকারি অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে যাতে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ না চেপে বসে সেদিকে ভাবার নজর ছিল।

AEC হল একটি সরকারি নীতি নির্ধারক সংস্থা আর DAE হল AEC-র নীতি বাস্তাবায়নের সরকারি সংস্থা। দুটি সংস্থাই পরমাণু শক্তিমন্ত্রকের অধীন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীই পরমাণু শক্তিমন্ত্রী। এই অবস্থায় ভাবা যাবতীয় বৃহৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা DAE-র অধীনে নিয়ে আসেন। পরমাণু গবেষণার জন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি অনুদান দেওয়া হতো না। তাই বিদেশ থেকে তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দেশে টেনে আনার মতো আকর্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে পারে নি, DAE পেরেছিল। ভাবা মনে করতেন শিল্পে অনুন্নত দেশকে উন্নত করতে গেলে বড় বড় সংগঠন তৈরি করতে হবে। ভাবা নেহেরুকে শান্তিপূর্ণ পরমাণু শক্তির কূটনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বের কথা বুঝিয়েছিলেন। নেহেরু কিন্তু পরমাণুর শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কথাই বলতেন। ভাবার পরমাণু অস্ত্র বিরোধীতায় উৎসাহ ছিল না। পরমাণু অস্ত্র মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক পাগওয়াশ আন্দোলনে তিনি যুক্ত হতে রাজি হন নি। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও বার্ট্রান্ড রাসেল-এর উদ্যোগে পরমাণু অস্ত্র বিরোধী ম্যানিফেস্টো তৈরি করার সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রাসেল বলেছিলেন :

আমি আশা করেছিলাম যে এ বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এবং ভারত সরকারের সাহায্য পাব। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেহেরু যখন লন্ডন ভ্রমনে এলেন তখনই সেই আশার পরিসমাপ্তি ঘটে। নেহেরুকে খুবই সহানুভূতিশীল মনে হয়েছিল। আমি তার সাথে মধ্যাহ্নভোজন সেরেছি, নানা মিটিং ও বরণ অনুষ্ঠানে গিয়েছি। তিনি খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মসূচির শেষ দিকে যখন ভারতের মুখ্য সরকারি বিজ্ঞানী ড. ভাবার সাথে দেখা হল অত্যন্ত শীতল ব্যবহার পেলাম। আমার মনে যে করফারেন্সের (পাগওয়াশ) কথা ছিল তাতো দূরস্থান, এই ধরণের ম্যানিফেস্টোতেই তাঁর খুব সন্দেহ ছিল। ভারতের সরকারি বিজ্ঞানী মহল থেকে আমি যে কোনও উৎসাহ পাব না তা আমার কাছে পরিস্কার হল।

অধ্যাপক ডি ডি কোসাম্বী পরমাণু গবেষণা ও উন্নয়নের বিপুল খরচ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, খোলামেলা ও অংশগ্রহণকারী ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। তাই তাঁকে ১৯৬২ সালে TIFR থেকে বিতারিত করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে এক জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ১৯৭০ সালে দেশে একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুরী। উদ্দেশ্য ছিল ১৯৫৮ সালে গৃহীত বিজ্ঞান নীতির পর্যলোচনা করা। সেখানে বলা হয়েছিল যে '৫৮ সালে গৃহীত বিজ্ঞান নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখা গেছে। প্রস্তাবের অনেক কথাই কাগজে-কলমে থেকে গেছে।

১৯৭৮ সালে প্রযুক্তির স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার অবস্থা ক্ষতিয়ে দেখতে এক কমিটির পর্যালোচনায় বলা হয়েছিল যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও গবেষণায় রাষ্ট্রের উদ্যোগ হতাশজনক। অধ্যাপক ওয়াই নয়ুদামার সভাপতিত্বে ওই কমিটি জানিয়েছিল যে আগেকার পর্যালোচনা কমিটির পরামর্শ মানা হয়নি, গবেষণা ও উন্নয়ন ঘটেছে অতি সামান্য। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উদ্যোগ ভারতীয় সমাজের কাজে লাগে নি। ১৯৮০

সালে ওই কমিটি সিদ্ধান্তে আসে যে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটানো এবং তা বজায় রাখার জন্য জোরদার উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং অন্যান্য সামাজিক প্রয়োজনের তুলনায় এই উদ্যোগে প্রয়োজনীয় মানুষের সংখ্যা খুবই কম। পৃথিবীর দশটি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে ভারত একটি, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যায় ভারত তৃতীয় বৃহৎ—এইসব যাবতীয় সরকারি দাবিকে ওই কমিটি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কমিটির মতে, প্রযুক্তিগতভাবে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা, শিক্ষার সুযোগ এবং প্রযুক্তির কতটা সুবিধা দেশ পাচ্ছে সেই হিসাব ধরলে সরকারি সাফল্যের দাবি মেনে নেওয়া যায় না। কমিটির মতামত সরকার এড়িয়ে গিয়েছিল। ততদিনে দেশে বৈজ্ঞানিক আমলাতন্ত্র জাঁকিয়ে বসেছিল।

১৯৭১ সালে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী সরকার গঠিত হওয়ার পর পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোমার নকশা তৈরি হয়ে গেলেও দু-বছর লেগেছিল প্লুটোনিয়াম উৎপাদন ও আনুসঙ্গিক ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের সিংহ ভাগ কাজ করেছিল BARC। হাই এক্সপ্লোসিভ লেন্স উন্নয়ন ও স্থাপনের কাজ করেছিল ডিফেন্স রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (DRDO)। ১৯৭৪ সালে ভারত ভূ-গর্ভস্থ পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায়। ভারতের দাবি ছিল, বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য হল পারমাণবিক প্রযুক্তির পরীক্ষা, খনন কাজের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নানা সুবিধার আশা এবং মাটির নীচে তেলের ভাণ্ডারে নাড়া দেওয়া, যাতে তা উৎপাদনের হার ও পরিমাণ—দুই-ই বাড়ে। সবাই কিন্তু বুঝেছিল ভারত পরমাণু অস্ত্র উৎপাদনের সক্ষমতাই পরীক্ষা করতে চায়। BARC-এর তদানিন্তন প্রধান, রাজা রামান্না, নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় জানিয়েছিলেন, পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার ফলে তাঁর মর্যদা খুবই বেড়ে গিয়েছিল।

পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্লুটোনিয়াম উৎপাদিত হয়েছিল BARC-এর গবেষণা চুল্লি সাইরাসে। ৪০ মেগাওয়াটের ওই চুল্লিটি সরবরাহ করেছিল কানাডা, চালু হয় ১৯৬০ সালে। চুল্লিটিতে বছরে ৯ থেকে ১০ কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম উৎপাদিত হতো। কানাডার সঙ্গে চুক্তির শর্ত ছিল, চুল্লিটি শুধু শান্তিপূর্ণ কাজেই ব্যবহার করা যাবে। ভারত দাবি করে, সাইরাসে উৎপাদিত প্লুটোনিয়াম শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক বিস্ফোরণে ব্যবহার করা যাবে না এমন কোনও শর্ত ছিল না। ১৯৬৪ সালে চালু ট্রম্বের পুনঃশোধন কেন্দ্রে সাইরাসের নিঃশেষিত জ্বালানি থেকে রাসায়নিক উপায়ে প্লুটোনিয়াম নিঃষ্কাশন করা হতো। সাইরাসে IAEA অথবা কানাডা কারুরই তদারকি ছিল না। তাই কতটা প্লুটোনিয়াম উৎপাদিত হয়েছে তা গোপন ছিল।

দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে পরমাণু শক্তি এবং মহাকাশ গবেষণা ভোটের সময় ইমেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ১৯৭৪ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উত্তর প্রদেশের নারোরায় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। সরকারের পরিবেশ বিভাগ অঞ্চলটির নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিকূল রিপোর্ট পেশ করেছিল কিন্তু আসন্ন ভোটের কথা ভেবেই ইন্দিরা গান্ধী সেই রিপোর্ট মানেন নি। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিল উন্নয়নের প্রতীক।

এরইমধ্যে বিস্ফোরণ থেকে পাওয়া নানা তথ্যের সাহায্যে পরবর্তীকালে ভারত নিঃক্ষেপযোগ্য পরমাণু বোমা তৈরি করে। বোমার নকশায় পরিবর্তন ঘটিয়ে ছোট বোমা তৈরি করে তা বোমারু বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রে স্থাপন করে। অন্যদিকে প্লুটোনিয়াম ধাতুশোধন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটিয়ে প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশন করতে গিয়ে যতটা প্লুটোনিয়াম নষ্ট হয় তার পরিমাণ কমাতে এবং বাতিল প্লুটোনিয়াম পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়ে ওঠে। বিশুদ্ধ প্লুটোনিয়াম উৎপাদনও সম্ভব হয়, যার ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী অস্ত্র কাজ করবে এই প্রত্যয় জোরদার হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালেই পরমাণু অস্ত্র গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ চলেছে।

সাইরাসে উৎপাদিত প্লুটোনিয়াম পরমাণু বোমার জন্য ব্যবহার করা নিয়ে সমস্যা ছিলই। তাই ১৯৮৫ সালের ৮ অগস্ট ট্রম্বেতে ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষণা চুল্লি ধ্রুব চালু করা হয়। চুল্লিটি সাইরাসের অনুকরণে নির্মিত। এখানে বছরে ২০ থেকে ২৫ কিলোগ্রাম অস্ত্র উৎপাদনের উপযোগী প্লুটোনিয়াম উৎপাদিত হতো। ট্রম্বের বর্ধিত ক্ষমতাসম্পন্ন পুনঃশোধন কেন্দ্রে ওই প্লুটোনিয়াম নিঃষ্কাশন করা হতো। তবে নানা সমস্যা দেখা দেওয়ায় আশির দশকের শেষ ভাগের আগে ধ্রুব থেকে খুব বেশি প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায়নি।

১৯৮৫-র শেষে অথবা ১৯৮৬-র গোড়ায় তারাপুরে

দ্বিতীয় একটি পুনঃশোধন কেন্দ্রে নিঃশেষিত জ্বালানি থেকে প্লুটোনিয়াম নিঃষ্কাশন শুরু করা হয়। সেখানে সাইরাস এবং IAEA-এর তদারকিতে থাকা অন্য বাণিজ্যিক পরমাণু চুল্লির নিঃশেষিত জ্বালানি থেকে প্লুটোনিয়াম নিঃষ্কাশন চালু হয়। সেখানে তদারকি বিহীন ম্যাড্রাস অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন (MAPS)-এর নিঃশেষিত জ্বালানিরও প্রক্রিয়াকরণ করা হতো। বোঝা গিয়েছিল যে ভারত বাণিজ্যিক পরমাণু চুল্লি থেকেই পরমাণু বোমার উপযোগী প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করতে পারে। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় কলপক্কমে আরেকটি পুনঃশোধন কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। ডেভিড অলব্রাইট এবং মার্ক হিবস-এর মতে, ১৯৯১ সালের মধ্যে ভারতে প্রায় ২৯০ কিলোগ্রাম বোমা তৈরির উপযোগী প্লুটোনিয়াম মজুত হয়েছিল। তার এক তৃতীয়াংশ এসেছিল ধ্রুব থেকে , বাকিটা সাইরাস থেকে। তাঁদের হিসাব মতো ১৯৯৫ সালের শেষে চারশো কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম মজুত হবার কথা। অতিরিক্ত প্লুটোনিয়ামের সবটাই এসেছিল ধ্রুব থেকে।

নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই পরমাণু চুল্লির জ্বালানি হিসাবে ইউরেনিয়াম-২৩৩ ব্যবহারের জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। চুল্লির জ্বালানি হিসাবে থোরিয়াম এবং অথবা ইউরেনিয়াম-২৩৩ ব্যবহারের জন্য বিপুল উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রাকৃতিক থোরিয়ামকে বিকিরিত করে ইউরেনিয়াম-২৩৩ উৎপাদন করা হয়। সাইরাস, ধ্রুব ও MAPS চুল্লিতে থোরিয়ামকে বিকিরিত করে কয়েক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম-২৩৩ উৎপাদিত হয়েছিল।

ভারতে তেমন উল্লেখযোগ্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র নেই। অথচ ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে ঘোষণা করা হয়েছিল, ভারত যে কোনও মাত্রায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ করতে পারে। আশির দশকের মাঝামাঝি BARC-এ ১০০টি গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ বিশিষ্ট এক ছোট সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র চালু হয়েছিল। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি মহীশূরে আরেকটি ছোট সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র চালু করা হয়। এই দুই কেন্দ্রে চুল্লির জ্বালানি হিসাবে বছরে কয়েকশো কিলোগ্রাম কম সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম অথবা কয়েক কিলোগ্রাম অস্ত্রপোযোগী বেশি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন করা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্র (তাপকেন্দ্রকীয় বা হাইড্রোজেন বোমা) উৎপাদন পরিকল্পনার অঙ্গ। এই অস্ত্রের ক্ষমতা ডয়টরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম বিভাজনের ওপর নির্ভরশীল হলেও পারমাণবিক বিভাজনের মাধ্যমেই সংযোজন শুরু হয়। প্রাথমিক বিস্ফোরণের জন্য ইউরেনিয়াম অথবা প্লুটোনিয়াম লাগে।

আশির দশকে BARC বিপুল পরিমাণ বিশুদ্ধ বেরিলিয়াম ধাতু আমদানি করেছিল। পরে ভারতেই বেরিলিয়াম উৎপাদন শুরু হয়। বেরিলিয়ামের সাহায্যে কম আয়তনের, হালকা এবং আধুনিক পরমাণু বোমা তৈরি করা সম্ভব। নিউট্রন প্রতিফলকের সাহায্যে (বেরিলিয়াম খুবই কার্যকরী প্রতিফলক) শৃঙ্খল বিক্রিয়া বজার রাখতে অথবা সংকট ভরের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাজনক্ষম পদার্থের পরিমাণ কমিয়ে ফেলা যায়।

ভারতে ট্রিটিয়াম উৎপাদিত হচ্ছে। অর্থাৎ চাইলে ভারত ট্রিটিয়াম বুস্টেড বিভাজনক্ষম অস্ত্র উৎপাদন করতে পারে। তবে এই অস্ত্র নির্মাণ করতে গেলে পুরো দস্তুর পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো দরকার। কয়েক গ্রাম ট্রিটিয়ামের সাথে যদি সম পরিমাণ ডয়টরিয়াম রাখা যায় তাহলে বিস্ফোরণের ক্ষমতা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ায় অস্ত্রের আয়তন ও ওজন কম করে ফেলা যায়।

হাইড্রোজেন বোমায় তাপকেন্দ্রকীয় জ্বালানি হিসাবে লিথিয়াম ডয়টেরাইড ব্যবহার করা হয়। ভারতের লিথিয়াম উৎপাদন ও বিশুদ্ধকরণ কর্মসূচি রয়েছে। ১৯৮৫ সালে পশ্চিম জার্মানীর গোয়েন্দা বিভাগের নথীতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাধ্যমে BARC-কে তাপকেন্দ্রকীয় অস্ত্র উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তান পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটালে যেন দু-মাসের মধ্যে ভারত তাপকেন্দ্রকীয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। অস্ত্র উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণু অস্ত্রবহনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নের কাজও ভারত সমানতালে চালিয়েছে।

প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সময় ও তারপরে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল অতি দুর্বল। ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির জন্য

আমেরিকার প্রতি তেমন নির্ভরশীলতাও ছিল না। সত্তরের দশকের শেষে ভারতে চালু এবং নির্মাণের কাজ চালু হয়েছে এমন চুল্লির মধ্যে ৫টি ছিল গবেষণা চুল্লি, ৭টি বাণিজ্যিক চুল্লি এবং ৩টি পুনঃশোধন কেন্দ্র। এরমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কেবল তারাপুরের একটি চুল্লি সরবরাহ করেছিল। ১২টি চুল্লির কোনওটিতেই IAEA-র তদারকি ছিল না। আমেরিকার বক্তব্য ছিল, এই ১২টি চুল্লিতে যদি ভারত IAEA-র তদারকি চালু না করে তাহলে তারাপুরের চুল্লিটির জ্বালানি, কম সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম, সরবরাহ বন্ধ করে দেবে। '৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কানাডা একই নীতি গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন মার্কিন দাবি সমর্থন করেছিল। বৃহৎ শক্তির এই অবস্থানে ভারত বেকায়দায় পড়েছিল। প্রজনী চুল্লি প্রযুক্তির জন্য ভারত ফ্রান্সের ওপর নির্ভরশীল ছিল। থোরিয়াম নির্ভর প্রযুক্তি চালু করার জন্য পশ্চিম জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত সাহায্য দরকার। ভারতে থোরিয়ামের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচির কেন্দ্রে থাকবে থোরিয়াম কনভার্টার বা প্রজনী চুল্লি প্রযুক্তি। এই অবস্থায় বিদেশী সাহায্য বন্ধ হলে খুবই বিপদ। অন্যদিকে ইউরেনিয়াম আমদানিরও প্রয়োজন। কারণ দেশে ইউরেনিয়ামের ভান্ডার অপ্রতুল। তা উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতাও কম। কাজেই ইউরেনিয়াম রপ্তানিকারী দেশের সাহায্য পেতেই হবে। সেইসব দেশের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া সবাই চাইত যে ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচিতে IAEA-র নিয়ন্ত্রণ চালু হোক।

যুক্তরাষ্ট্রের কার্টার প্রশাসন চেয়েছিল ভারত যেন IAEA-র তদারকি ব্যবস্থা মেনে নেয়। তাহলেই প্লুটোনিয়াম উৎপাদন বন্ধ হবে। কিন্তু মোরারজী দেশাই সরকার পরমাণু কেন্দ্রগুলোকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজি হয়নি। পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকেই ভারত বলে এসেছে যে নতুন নতুন দেশের পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন যদি ঠেকাতে হয় তাহলে বৃহৎ শক্তিকে এই অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। এবং তাদের চাপে যদি চিন এই চেষ্টা থেকে বিরত থাকে তাহলেই ভারত পরমাণু অস্ত্র তৈরির উদ্যোগ বন্ধ করবে। পরমাণু অস্ত্রে বলিয়ান বৃহৎ শক্তিধর দেশের পক্ষে নানা দেশের কাছে পরমাণু অস্ত্র তৈরি না করার কথা আদায় করা অনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার অঙ্গ। পরমাণু অস্ত্রধর দেশ যদি সার্বিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (CTBT) মেনে চলে, বিভাজনক্ষম পদার্থ উৎপাদন বন্ধ করে, অস্ত্র মুক্তির উদ্দেশ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় সেক্ষেত্রে ভারত পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে পারে।

ভারত বরাবর বলে এসেছে যে NPT অস্ত্রহীনকে নিরস্ত্র করতে চেয়েছে, অস্ত্রধারীরা অস্ত্রসজ্জিত হয়েই চলেছে। NPT হরাইজন্টাল প্রলিফারেশন বন্ধ করবে ঠিকই কিন্তু তাতে ভার্টিকাল প্রলিফারেশন বন্ধ হবে না। যাদের পরমাণু অস্ত্র নেই তাদের পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে নিষেধ করা হচ্ছে। অথচ পরমাণু অস্ত্রধারী দেশগুলো এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিচ্ছে না। পরমাণু অস্ত্রহীন দেশের যাবতীয় পরমাণু কর্মসূচিতে নিয়ন্ত্রণ চালু করতে বলা হচ্ছে, অথচ পরমাণু অস্ত্রধর দেশের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ যদি আদৌ থাকে তাও তাদের ইচ্ছে মতো হতে হবে। তাই ভারত NPT মানে নি। যে সব দেশের পরমাণু অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা একেবারেই নেই তারাই NPT মেনেছে। যে সব দেশ পরমাণু শক্তিধর দেশের মিত্র অর্থাৎ প্রতিরোধী পরমাণু অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল তারাও এই চুক্তি মেনেছে। কিন্তু পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে সক্ষম নির্জোট কোনও দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। তাই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মার্কিন প্রচেষ্টাকে ভারত মনে করেছিল, আলাপ আলোচনায় পেরে না উঠে জোড় খাটানোর চেষ্টা। পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো নিজেদের অবস্থান না বদলালে ভারত তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না বলে জানিয়েছিল। পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোকে (ক) CTBT নিয়ে আলোচনা করতে হবে। (খ) পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদন করা চলবে না এবং (গ) পরমাণু অস্ত্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের শর্তে রাজী হয়নি।

মোরারজী দেশাই ছিলেন NPT বিরোধী। তিনি অস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম হয়ে ওঠার পক্ষে কথা বলতেন, যা তার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীও সমর্থন করতেন। মোরারজী দেশাইয়ের আমলে বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন জনসংঘের প্রতিনিধি। জনসংঘ বরাবরই ছিল অস্ত্র উন্নয়নের

পক্ষে। দেশাইয়ের শীর্ষ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কে শুব্রমনিয়ামও ভারতীয় পরমাণু বোমার পক্ষে বলতেন।

ভারত নানা সময়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করা শুধু সিদ্ধান্ত নেবার অপেক্ষায়। ১৯৯০ সালে AEC-র চেয়ারম্যান পি কে আয়েঙ্গার জানিয়েছিলেন, কতটুকু সময়ের মধ্যে আমরা তা তৈরি করবো তা নির্ভর করছে হাতে কতটা সময় পাচ্ছি তার ওপর। পরমাণু অস্ত্র তৈরি করার ক্ষমতা যে ভারতের রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তা জানত। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে CIA-র অধিকর্তা রবার্ট গেট্‌স কংগ্রেসের এক কমিটিকে জানিয়েছিলেন যে অচিরেই ভারত পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলতে পারে। যুদ্ধ বিমানের রদবদল ঘটিয়ে পরমাণু বোমা নিক্ষেপও করতে পারে। পরীক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপনের পর বোঝা গেছে যে কিছুদিনের মধ্যেই ভারত চিনের দিকে তাক করে পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র সাজিয়ে রাখবে।

আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনা সরিয়ে নেওয়া ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক সংকট নিয়ে আমেরিকা বেশি করে মাথা ঘামাতে শুরু করে। যাতে দক্ষিণ এশিয়া পরমাণু অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল হিসাবে গড়ে ওঠে সেই উদ্দেশে ১৯৯১-এর শেষে ভারত, পাকিস্তান, চিন ও রাশিয়াকে নিয়ে আলোচনায় উদ্যোগি হয়। ততদিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ভারতের পাশে ছিল না। আর্থিকভাবে বিপন্ন বলে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশের সাথে ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু তারপরও NPT-তে স্বাক্ষর করবে না বলে জানিয়েছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক কেন্দ্রে নজরদারি ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার বিনিময়ে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা সুসম্পর্কের সুবাদে উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত মার্কিন যুদ্ধ সরঞ্জামসহ অন্যান্য সামগ্রী কিনতে চেয়েছিল। ১৯৯২ সালের মে মাসে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার, পর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মন কষাকষির সময়েও দুই দেশের মধ্যে এইসব ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা হয়েছে। তার কয়েক সপ্তাহ আগে রাশিয়া ভারতকে ক্রায়োজেনিক রকেট (তরল জ্বালানি বিশিষ্ট) বিক্রির পরিকল্পনা করছে জানতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও রাশিয়ার মহাকাশ বিভাগকে রকেট প্রযুক্তি বিক্রিতে দু-বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, রকেট আমদানির মাধ্যমে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি উপকৃত হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা কিভাবে বন্ধ করা যায় তা নিয়ে যখন ভারত ও আমেরিকার আলোচনা চলছে, ভারত কিন্তু পরমাণু অস্ত্র তৈরির কাজ চালিয়েই যাচ্ছিল।

Bertrand Russel, The Autobiograpy of Bertrand Russel, Vol-III, (London : Allen & Unwin 1969 ed.) P. 80
William Sweet, The US-India Safeguards Dispute, The Bulletin of the Atomic Scientists, June, 1978
Dhirendra Sharma, India's Lopsided Science, The Bulletin of the Atomic Scientists, May, 1991
David Albright and Mark Hibbs, India's Silent Bomb, The Bulletin of the Atomic Scientists, Sept., 1992

ফ্লোরাইড বিষক্রিয়ার তাণ্ডব এখন পশ্চিমবঙ্গেও

মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

ধরিত্রীকে মাতা বললেও তিনি আবার বিষকুম্ভও বটে। ধরিত্রী তার বুকের ভিতর ধারণ করে থাকে অনেক বিষও। ভালো করে না বুঝে শুনে ভূগর্ভজল আহরণে সৃষ্ট এক আর্সেনিক সমস্যাতেই পশ্চিমবঙ্গ জেরবার, তাতে এখন আবার জানা যাচ্ছে ভূগর্ভজল বাহিত হয়ে উঠে আসছে আর একটি ভয়ঙ্কর অজৈব রাসায়নিক বিষ, যা মানুষ ও জীবদেহে, বিশেষ করে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে, প্রবেশ করে বিস্তর অসুখ-বিসুখ, ব্যথা - বেদনার পঙ্গুত্ব-মৃত্যুর কারণ হয়। জলে ফ্লোরাইড থাকলে বাইরে থেকে, রাসায়নিক পরীক্ষা না করে, বোঝাই সম্ভব নয় যে তাতে ফ্লোরাইড বিষ আছে। কারণ ফ্লোরাইডের না আছে বর্ণ, না স্বাদ-গন্ধ। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই এটা ইউরোপ-আমেরিকায় জানা হয়ে গেছে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে তারা জনস্বাস্থ্য রক্ষা করে এসেছে। ফ্লোরাইড সমস্যা উন্নত দেশ সমূহে নিয়ন্ত্রিত হলেও, আমাদের মত অনুন্নত দেশ সমূহে তা ব্যাপক এবং প্রকট। চিন, ভারত, পাকিস্তান, মোঙ্গোলিয়া, তুরষ্ক, ইরাক, ইরাণ, লিবিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, তানজানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, ব্রাজিল, চিলি, আর্জেনটিনা প্রভৃতি দেশে ফ্লোরাইড ঘটিত অসুখ-বিসুখের সমস্যা এখনো বিরাট। পশ্চিমবঙ্গেও যে ফ্লোরাইড বিষণ সমস্যা যথেষ্ট তাও এখন জানা যাচ্ছে। পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, মালদার কিয়দংশ, দুই দিনাজপুর, দক্ষিণ 24 পরগণার বহু নলকুপের জলে ফ্লোরাইডের মাত্রা বিপদজনক সীমার উপরে। এসব বিষয়ে সামান্য যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা ভারত সরকার সূত্রেই পাওয়া যাচ্ছে। তাদের চাপে রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ (PHED) কিছু কাজ করেছেন। তবে সেখান থেকে বিধিমত আবেদন করেও, ও বার বার গিয়েও তথ্য সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি এখন পর্য্যন্ত। তবে তাঁদেরই আহরিত তথ্য ভিন্ন সূত্রে হাতে এসেছে এবং তা দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছি। শুনেছি এ ব্যাপারে (অর্থাৎ ফ্লোরোসিস মোকাবিলায়) 'কি করা যায়ক্স? নিয়ে রাজ্যসরকার উচ্চপর্য্যায়ের একটা আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে আহূত একজন ভিনরাজ্যের ফ্লোরাইড বিশেষজ্ঞ এখানকার কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা ও জ্ঞানের বহর দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন। এখন এ আলোচনায় আরো অগ্রসর হওয়ার আগে ফ্লোরাইড ও ফ্লোরাইড ঘটিত অসুখ-বিসুখের প্রাথমিক একটা পরিচিতি সেরে নেওয়া প্রয়োজন।

ফ্লোরাইড অধ্যুষিত অঞ্চলে দেখেছি মানুষজনদের, বাচ্চাদের বিশেষ করে দাঁতে হলদে, বাদামী, কালো ছোপ। আর ঘরে ঘরে মানুষের যন্ত্রণার কাতরানি। কেউ লাঠি ভর দিয়ে চলেন কেউ বা কুঁজো হয়ে। কেউ আবার বহু বছর শয্যাশায়ী।

ফ্লোরাইড পরিচিতি :

ফ্লোরিন হ্যালোজেন পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্য, যা রাসায়নিক ভাবে সর্বাধিক সক্রিয় এবং মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে থাকে না, পাওয়াও যায় না। বহুদিন পর্য্যন্ত ফ্লোরিন মৌল (F2) প্রস্তুতি ছিল রসায়নবিজ্ঞানের একটি দুরুহতম অসমাধিত সমস্যা, যার সমাধান করে (1886) ফ্রান্সের অঁরি ময়সা নোবেল পুরস্কার পান পরে। আমাদের ছাত্রাবস্থা পর্যন্ত ফ্লোরিনের রসায়ন ও রসায়নশিল্প বিশেষ এগোয়নি। অল্প যা ছিল তা সহজ, পড়তে বা পড়াতে বিশেষ অসুবিধে হত না। এখন দিন বদলেছে। ফ্লোরিন গ্যাস উৎপাদন এখন সহজতর হয়েছে। তার উৎপাদন ও বিপণনে এখন ব্যাপকতা এসেছে। ফ্লোরিন থেকে উৎপাদিত হচ্ছে বহু রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বেশীর ভাগই জৈবযৌগ, যাদের উৎপাদন ও বাজারজাত করে বহু বহুজাতিক সংস্থা প্রচুর মুনাফা করছে। কিছু দৃষ্টান্ত:

ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFCs); টেফ্লন ও ফ্লোরিন ঘটিত নানারকম প্লাষ্টিক; রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র নার্ভগ্যাস; ফ্লোরিন ঘটিত ওষুধপত্র, যার মধ্যে আছে কিছু অ্যানিসথেটিক রাসায়নিক, ক্যান্সারের কিছু ওষুধ, ফ্লোরিন ঘটিত কিছু

অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি।

রাসায়নিক ভাবে ফ্লোরিন সক্রিয়তম মৌল। তাই মুক্ত অবস্থায় সে থাকতেই পারে না। থাকে ফ্লোরাইড আয়ন হিসাবে, যাকে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের বিয়োজনে উৎপন্ন ধরা যায়। প্রকৃতিতে কয়েকটি আকরিকে থাকে। যথা : ফ্লোরস্পার, অ্যাপাটাইট, ক্রায়োলাইট ইত্যাদি। আর থাকে গ্র্যানাইট, ব্যাসাল্ট ইত্যাদি শিলায়। রেল লাইন ও রাস্তায় যে কালচে পাথর দেখা যায় তা ব্যাসাল্ট। বীরভূম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে এসব অনেক আছে। ফ্লোরাইড ঘটিত আকরিক বা শিলাস্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত জলে ফ্লোরাইড ঢুকে পড়ে এবং তার মাধ্যমে জীবদেহে অনুপ্রবেশ ঘটে। জলের একটা প্রধান ধর্ম হক্সল যে এটি একটি প্রায় সর্বজনীন দ্রাবক, যা কম বেশী সবকিছুই, এমনকি গ্র্যানাইটও, কিছুটা দ্রবীভূত করে নিয়ে আসে। কোন অঞ্চলের ভূরাসায়নিক বৈশিষ্ট্যই নির্ধারণ করে সেখানকার ভূগর্ভজলে ফ্লোরাইড আসবে কিনা।

জীবদেহে ফ্লোরাইডের অপক্রিয়া :

জীবদেহে প্রবেশ করতে পারলে ফ্লোরাইড তার কয়েকটি অসাধারণ রাসায়নিক বৈশিষ্টের জন্য জীবদেহের সূক্ষ্ম জটিল বিরাট রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে প্রচুর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং তাতে নানারকম অসুখ-বিসুখ সৃষ্টি হয়। বিস্তর ব্যথা-বেদনারও কারণ হয়। এইসব রোগকে ফ্লোরোসিস্ বা আরো সঠিকভাবে ফ্লোরাইড টক্সিকোসিস বলে। যেহেতু আমাদের দেশের চিকিৎসা শিক্ষার বইপত্র ইংল্যাণ্ড আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত, তাদের দেশের প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত, তাই ফ্লোরোসিস, আর্সেনিকোসিস, সর্পদংশন প্রভৃতি বিষয় ঐসব পুস্তকে প্রায় কিছুই থাকে না। অনুরূপে আমাদের কেমিস্ট্রি পঠন-পাঠনে জীবদেহে ফ্লোরাইডের ক্রিয়া বিষয়ে কিছু থাকে না। তাই এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আসা আমারও একই হাল। অর্ধশতাব্দীর রসায়নচর্চা গবেষণা সত্ত্বেও জীবদেহে ফ্লোরিনের অপক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। 2006 সালে বীরভূমের ফ্লোরাইড অধ্যুষিত নসীপুর গ্রামে গিয়ে, ফ্লোরোসিস আক্রান্ত মানুষজনদের করুণ অবস্থা দেখে এক ধাক্কায় চৈতন্যোদয় হ'ল। এ বিষয়ে পরে আবার আসবো। এটা প্রায়শ হচ্ছে যে, না জানার ফলেই ফ্লোরোসিস আক্রান্ত রোগীদের বহু ভুল চিকিৎসাই হয়ে চলেছে। যে রোগীকে ফ্লোরাইড মুক্ত পরিবেশে রাখতে পারলে, ফ্লোরাইডমুক্ত জল, খাবার দাবারের সুব্যবস্থা করতে পারলে আরোগ্য হত, তার বদলে তাদের স্ক্লেরোসিস্, স্পনডাইলোসিস, আরথ্রাইটিস, অষ্টিয়োপোরোসিস, রিকেট প্রভৃতি ভেবে দীর্ঘদিন ভুল চিকিৎসাই করা হয়।

মানবদেহে ফ্লোরাইডের বিষক্রিয়া আর্সেনিকের থেকে সামান্য কম, কিন্তু লেডের থেকে বেশী। তিনটি বিশেষ রাসায়নিক ধর্মের জন্যই জীবদেহে ফ্লোরাইড এত অনর্থ ঘটাতে পারে।

1. ফ্লোরাইড (F^-) ও হাইড্রক্সাইড মূলক (OH^-) এর ইলেকট্রনিক সজ্জা একইরকম এবং তাদের আকারও কাছাকাছি হবার জন্য হাড় ও দাঁতের ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সি ফসফেটে [Ca10(PO4)6 (OH)2] আয়ন বিনিময় করে সহজে কৃষ্ট্যাল ল্যাটিসে ঢুকে পড়ে ও জমতে থাকে। উৎপন্ন ফ্লোরো ফসফেটের ঘনত্ব ও ল্যাটিসের সামান্য পরিবর্তন হয়। ফলে হাড়গুলি হয়ে পড়ে ভঙ্গুর। অল্প আঘাতেই হাত পা ভাঙ্গে। ফ্লোরাইডের জন্য 'হিপ-ফ্র্যাকচারও' বেশি হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল শিরদাঁড়ার ফ্লোরোসিস বা 'স্কেলিটাল ফ্লোরোসিস'। এর ফলে মানুষ একেবারে পঙ্গু হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাহিত্যে যাকে বলে 'ক্রিপলিং ফ্লোরোসিস'। জল, বাতাস, খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্য দিয়ে যত ফ্লোরাইড শরীরে ঢোকে তার কিছু ঘাম, মলমূত্রাদি মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। অবশিষ্ট ফ্লোরাইডের নিরানব্বই শতাংশই হাড়ে ও দাঁতে জমে।

হাড় হল মস্তবড় কোলাজেন প্রোটিন টিসু বা কলা। তার ধাত্র (matrix) মধ্যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সি ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট কেলাস সমূহ নিষিক্ত (impregnated) থাকে। হাড়ের হয় ক্রমাগত ক্ষয়, গঠন, পুর্নগঠন। ফ্লোরাইডের দীর্ঘদিন ক্রনিক অনুপ্রবেশে হাড়ের গঠনে অস্বাভাবিকত্ব আসে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তরুণাস্থি বা কোমলাস্থি, টেণ্ডন, 'ক্যানসেলাস বোন' সমূহ। তাদের গঠনে বিকৃতি এলে অস্থিসন্ধি সমূহের কমনীয়তা কমে, আড়ষ্টতা বাড়ে। তাই হাত, ঘাড়, পিঠে ব্যথা হয়, নড়াচড়াতেও কষ্ট হয়। কখনও তারা স্থায়ী ভাবে বেঁকে যায়। ফ্লোরাইড অধ্যুষিত অঞ্চলে

রাজস্থান অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ

ধরিত্রীকে মাতা বললেও তিনি আবার বিষকুম্ভও বটে। ধরিত্রী তার বুকের ভিতর ধারণ করে থাকে অনেক বিষও। ভালো করে না বুঝে শুনে ভূগর্ভজল আহরণে সৃষ্ট এক আর্সেনিক সমস্যাতেই পশ্চিমবঙ্গ জেরবার, তাতে এখন আবার জানা যাচ্ছে ভূগর্ভজল বাহিত হয়ে উঠে আসছে আর একটি ভয়ঙ্কর অজৈব রাসায়নিক বিষ, যা মানুষ ও জীবদেহে, বিশেষ করে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে, প্রবেশ করে বিস্তর অসুখ-বিসুখ, ব্যথা - বেদনার পঙ্গুত্ব-মৃত্যুর কারণ হয়। জলে ফ্লোরাইড থাকলে বাইরে থেকে, রাসায়নিক পরীক্ষা না করে, বোঝাই সম্ভব নয় যে তাতে ফ্লোরাইড বিষ আছে। কারণ ফ্লোরাইডের না আছে বর্ণ, না স্বাদ-গন্ধ। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই এটা ইউরোপ-আমেরিকায় জানা হয়ে গেছে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে তারা জনস্বাস্থ্য রক্ষা করে এসেছে। ফ্লোরাইড সমস্যা উন্নত দেশ সমূহে নিয়ন্ত্রিত হলেও, আমাদের মত অনুন্নত দেশ সমূহে তা ব্যাপক এবং প্রকট। চিন, ভারত, পাকিস্তান, মোঙ্গোলিয়া, তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ, লিবিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, তানজানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, ব্রাজিল, চিলি, আর্জেনটিনা প্রভৃতি দেশে ফ্লোরাইড ঘটিত অসুখ-বিসুখের সমস্যা এখনো বিরাট। পশ্চিমবঙ্গেও যে ফ্লোরাইড বিষণ সমস্যা যথেষ্ট তাও এখন জানা যাচ্ছে। পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, মালদার কিয়দংশ, দুই দিনাজপুর, দক্ষিণ 24 পরগণার বহু নলকুপের জলে ফ্লোরাইডের মাত্রা বিপদজনক সীমার উপরে। এসব বিষয়ে সামান্য যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা ভারত সরকার সূত্রেই পাওয়া যাচ্ছে। তাদের চাপে রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ (PHED) কিছু কাজ করেছেন। তবে সেখান থেকে বিধিমত আবেদন করেও, ও বার বার গিয়েও তথ্য সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি এখন পর্য্যন্ত। তবে তাঁদেরই আহরিত তথ্য ভিন্ন সূত্রে হাতে এসেছে এবং তা দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছি। শুনেছি এ ব্যাপারে (অর্থাৎ ফ্লোরোসিস মোকাবিলায়) 'কি করা যায়'? নিয়ে রাজ্যসরকার উচ্চপর্য্যায়ের একটা আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে আহূত একজন ভিনরাজ্যের ফ্লোরাইড বিশেষজ্ঞ এখানকার কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা ও জ্ঞানের বহর দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন। এখন এ আলোচনায় আরো অগ্রসর হওয়ার আগে ফ্লোরাইড ও ফ্লোরাইড ঘটিত অসুখ-বিসুখের প্রাথমিক একটা পরিচিতি সেরে নেওয়া প্রয়োজন।

ফ্লোরাইড পরিচিতি :

ফ্লোরিন হ্যালোজেন পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্য, যা রাসায়নিক ভাবে সর্বাধিক সক্রিয় এবং মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে থাকে না, পাওয়াও যায় না। বহুদিন পর্য্যন্ত ফ্লোরিন মৌল (F2) প্রস্তুতি ছিল রসায়নবিজ্ঞানের একটি দুরুহতম অসমাধিত সমস্যা, যার সমাধান করে (1886) ফ্রান্সের আঁরি ময়সা নোবেল পুরস্কার পান পরে। আমাদের ছাত্রাবস্থা পর্যন্ত ফ্লোরিনের রসায়ন ও রসায়নশিল্প বিশেষ এগোয়নি। অল্প যা ছিল তা সহজ, পড়তে বা পড়াতে বিশেষ অসুবিধে হত না। এখন দিন বদলেছে। ফ্লোরিন গ্যাস উৎপাদন এখন সহজতর হয়েছে। তার উৎপাদন

ও বিপণনে এখন ব্যাপকতা এসেছে। ফ্লোরিন থেকে উৎপাদিত হচ্ছে বহু রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বেশীর ভাগই জৈবযৌগ, যাদের উৎপাদন ও বাজারজাত করে বহু বহুজাতিক সংস্থা প্রচুর মুনাফা করছে। কিছু দৃষ্টান্ত:

ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFCs); টেফ্লন ও ফ্লোরিন ঘটিত নানারকম প্লাষ্টিক; রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র নার্ভগ্যাস; ফ্লোরিন ঘটিত ওষুধপত্র, যার মধ্যে আছে কিছু অ্যানিসথেটিক রাসায়নিক, ক্যান্সারের কিছু ওষুধ, ফ্লোরিন ঘটিত কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি।

রাসায়নিক ভাবে ফ্লোরিন সক্রিয়তম মৌল। তাই মুক্ত অবস্থায় সে থাকতেই পারে না। থাকে ফ্লোরাইড আয়ন হিসাবে, যাকে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের বিয়োজনে উৎপন্ন ধরা যায়। প্রকৃতিতে কয়েকটি আকরিকে থাকে। যথা : ফ্লোরস্পার, অ্যাপাটাইট, ক্রায়োলাইট ইত্যাদি। আর থাকে গ্র্যানাইট, ব্যাসাল্ট ইত্যাদি শিলায়। রেল লাইন ও রাস্তায় যে কালচে পাথর দেখা যায় তা ব্যাসাল্ট। বীরভূম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে এসব অনেক আছে। ফ্লোরাইড ঘটিত আকরিক বা শিলাস্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত জলে ফ্লোরাইড ঢুকে পড়ে এবং তার মাধ্যমে জীবদেহে অনুপ্রবেশ ঘটে। জলের একটা প্রধান ধর্ম হক্সল যে এটি একটি প্রায় সর্বজনীন দ্রাবক, যা কম বেশী সবকিছুই, এমনকি গ্র্যানাইটও, কিছুটা দ্রবীভূত করে নিয়ে আসে। কোন অঞ্চলের ভূরাসায়নিক বৈশিষ্ট্যই নির্ধারণ করে সেখানকার ভূগর্ভজলে ফ্লোরাইড আসবে কিনা।

জীবদেহে ফ্লোরাইডের অপক্রিয়া :

জীবদেহে প্রবেশ করতে পারলে ফ্লোরাইড তার কয়েকটি অসাধারণ রাসায়নিক বৈশিষ্টের জন্য জীবদেহের সূক্ষ্ম জটিল বিরাট রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে প্রচুর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং তাতে নানারকম অসুখ-বিসুখ সৃষ্টি হয়। বিস্তর ব্যথা-বেদনারও কারণ হয়। এইসব রোগকে ফ্লোরোসিস্ বা আরো সঠিকভাবে ফ্লোরাইড টক্সিকোসিস বলে। যেহেতু আমাদের দেশের চিকিৎসা শিক্ষার বইপত্র ইংল্যাণ্ড আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত, তাদের দেশের প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত, তাই ফ্লোরোসিস, আর্সেনিকোসিস, সর্পদংশন প্রভৃতি বিষয় ঐসব পুস্তকে প্রায় কিছুই থাকে না। অনুরূপে আমাদের কেমিস্ট্রি পঠন-পাঠনে জীবদেহে ফ্লোরাইডের ক্রিয়া বিষয়ে কিছু থাকে না। তাই এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আসা আমারও একই হাল। অর্ধশতাব্দীর রসায়নচর্চা গবেষণা সত্ত্বেও জীবদেহে ফ্লোরিনের অপক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। 2006 সালে বীরভূমের ফ্লোরাইড অধ্যুষিত নসীপুর গ্রামে গিয়ে, ফ্লোরোসিস আক্রান্ত মানুষজনদের করুণ অবস্থা দেখে এক ধাক্কায় চৈতন্যোদয় হক্সল। এ বিষয়ে পরে আবার আসবো। এটা প্রায়শ হচ্ছে যে, না জানার ফলেই ফ্লোরোসিস আক্রান্ত রোগীদের বহু ভুল চিকিৎসাই হয়ে চলেছে। যে রোগীকে ফ্লোরাইড মুক্ত পরিবেশে রাখতে পারলে, ফ্লোরাইডমুক্ত জল, খাবার দাবারের সুব্যবস্থা করতে পারলে আরোগ্য হত, তার বদলে তাদের স্ক্লেরোসিস্, স্পনডাইলোসিস, আরথ্রাইটিস, অষ্টিয়োপোরোসিস, রিকেট প্রভৃতি ভেবে দীর্ঘদিন ভুল চিকিৎসাই করা হয়।

মানবদেহে ফ্লোরাইডের বিষক্রিয়া আর্সেনিকের থেকে সামান্য কম, কিন্তু লেডের থেকে বেশী। তিনটি বিশেষ রাসায়নিক ধর্মের জন্যই জীবদেহে ফ্লোরাইড এত অনর্থ ঘটাতে পারে।

1. ফ্লোরাইড (F^-) ও হাইড্রক্সাইড মূলক (OH^-) এর ইলেকট্রনিক সজ্জা একইরকম এবং তাদের আকারও কাছাকাছি হবার জন্য হাড় ও দাঁতের ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সি ফসফেটে [Ca10(PO4)6 (OH)2] আয়ন বিনিময় করে সহজে কৃষ্ট্যাল ল্যাটিসে ঢুকে পড়ে ও জমতে থাকে। উৎপন্ন ফ্লোরো ফসফেটের ঘনত্ব ও ল্যাটিসের সামান্য পরিবর্তন হয়। ফলে হাড়গুলি হয়ে পড়ে ভঙ্গুর। অল্প আঘাতেই হাত পা ভাঙ্গে। ফ্লোরাইডের জন্য 'হিপ-ফ্র্যাকচারও' বেশি হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল শিরদাঁড়ার ফ্লোরোসিস বা 'স্কেলিটাল ফ্লোরোসিস'। এর ফলে মানুষ একেবারে পঙ্গু হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাহিত্যে যাকে বলে 'ক্রিপলিং ফ্লোরোসিস'। জল, বাতাস, খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্য দিয়ে যত ফ্লোরাইড শরীরে ঢোকে তার কিছু ঘাম, মলমূত্রাদি মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। অবশিষ্ট ফ্লোরাইডের নিরানব্বই শতাংশই হাড়ে ও দাঁতে জমে।

হাড় হল মস্তবড় কোলাজেন প্রোটিন টিসু বা কলা। তার ধাত্র (matrix) মধ্যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সি ফসফেট ও ক্যালসিয়াম

কার্বনেট কেলাস সমূহ নিষিক্ত (impregnated) থাকে। হাড়ের হয় ক্রমাগত ক্ষয়, গঠন, পুর্নগঠন। ফ্লোরাইডের দীর্ঘদিন ক্রনিক অনুপ্রবেশে হাড়ের গঠনে অস্বাভাবিকত্ব আসে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তরুণাস্থি বা কোমলাস্থি, টেণ্ডন, 'ক্যানসেলাস বোনক্স সমূহ। তাদের গঠনে বিকৃতি এলে অস্থিসন্ধি সমূহের কমনীয়তা কমে, আড়ষ্টতা বাড়ে। তাই হাত, ঘাড়, পিঠে ব্যথা হয়, নড়াচড়াতেও কষ্ট হয়। কখনও তারা স্থায়ী ভাবে বেঁকে যায়। ফ্লোরাইড অধ্যুষিত অঞ্চলে মানুষজন, গবাদিপশু ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এইসব অনেক দেখা যায়।

ক্রনিক বিষণ বা দীর্ঘদিন শরীরে অল্পমাত্রায় ফ্লোরাইডের অনুপ্রবেশের বহির্লক্ষণ প্রধানত দুটি:
একটি, পঙ্গুকারী ফ্লোরোসিস (crippling fluorosis)। অপরটি দাঁতের চিত্রবিচিত্রতা (mottled enamel) । ফ্লোরাইড অধ্যুষিত অঞ্চলে দেখেছি মানুষজনদের, বাচ্চাদের বিশেষ করে দাঁতে হলদে, বাদামী, কালো ছোপ। আর ঘরে ঘরে মানুষের যন্ত্রণার কাতরানি। কেউ লাঠি ভর দিয়ে চলেন কেউ বা কুঁজো হয়ে। কেউ আবার বহু বছর শয্যাশায়ী। এপাশ ওপাশ করতেও অপরের সাহায্য ছাড়া হয় না। অকাল বার্ধক্য সর্বত্র প্রকট। ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ুতন্ত্রীয়, বিপাকীয় ক্রিয়া কর্ম। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে মানুষে মানুষে সব সময়ই পার্থক্য থাকে, একই মাত্রার বিষে প্রতিক্রিয়ায় পার্থক্য দেখা যায়। আবার ফ্লোরাইডে উন্মুক্ত ব্যক্তিদের খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগত মানও নির্ধারণ করে তার সহনশীলতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা। অতএব এটা পরিষ্কার যে যে সব অঞ্চলের মানুষজন দরিদ্র, তাদের পুষ্টিমান নিম্ন এবং ফ্লোরাইড মুক্ত পানীয় জল রান্নার জল পায় না, তাদের জীবনভর বর্ধিত যন্ত্রণা থাকবেই।

এলুমিনিয়াম ও অন্যান্য কিছু ধাতু নিষ্কাশন ও ফসফেট সার উৎপাদন কারখানার আশপাশের জল ও বাতাসে ফ্লোরাইড দূষণ ছড়ায়। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত বহু দেশে এইসব দূষণ অনেকটাই আজ নিয়ন্ত্রিত।

2. জীবদেহে ফ্লোরাইডের প্রকট অপক্রিয়ার আর একটি কারণ হক্সল ফ্লোরাইডের জোরালো হাইড্রোজেন বন্ধন শক্তি। আগেই বলেছি হাড় হল একটি প্রোটিন টিসু। ফ্লোরাইড তার হাইড্রোজেন বন্ধন শক্তির দ্বারা প্রোটিনের জটিল আনবিক গঠনে বিকৃতি আনে। তাদের কার্যকারিতা ক্ষুন্ন হয়, হাড়ের বিকৃতি ঘটায়। দাঁত ওঠার সময় অ্যামেলোজেনিন (amelogenin) প্রোটিনের সংশ্লেষণ বিঘ্নিত করে দাঁতে বিকৃতি আনে, 'মটলিংও' হয়। ফ্লোরাইড ডি এন এ'র হাইড্রোজেন বন্ধনীগুলিকেও ভাঙ্গতে পারে, এবং তাদের মেরামতিতেও বিঘ্ন ঘটায়। জিনের পরিবর্তনও ঘটায়।

3. ফ্লোরাইডের আবার আছে জটিল যৌগ তৈরী করবার বিশেষ প্রবণতা ও ক্ষমতা। ফ্লোরাইড ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন প্রভৃতির সাথে শক্ত রাসায়নিক বন্ধনে যুক্ত হয়ে তাদের কার্যকারিতা ক্ষুন্নকরে। ফলে বহু এনজাইম তাদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্ম করতে পারে না। ফলে নানাবিধ অসুখ বিসুখ স্বাভাবিক।

ফ্লোরাইড ও অ্যালঝাইমার :

লণ্ডনের কিংস কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর জন এমসলে একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তাত্ত্বিক গণনা থেকে তিনি দেখিয়েছেন (1981) ফ্লোরাইড ডি এন এ'র হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙ্গতে পারে। তিনি বিগত কয়েক বছর ধরে রাসায়নিক দ্রব্যাদি, মানুষ ও পরিবেশ নিয়ে অনেক বই লিখেছেন। একটি বইতে তিনি দেখিয়েছেন যে এলুমিনিয়াম অ্যালঝাইমারের কারক, যা অনেক বিজ্ঞানীরা বলছেন, তা ভিত্তিহীন। তিনি বলছেন এইরকম অপপ্রচার এলুমিনিয়ামের মত প্রয়োজনীয় উপকারী একটি শিল্পের বিরুদ্ধে অসঙ্গত অপপ্রচার। মাস কয়েক আগে আমি তাঁকে লিখলাম এলুমিনিয়াম আয়নের সাথে ফ্লোরাইড ও দেহস্থ হাইড্রক্সিল মূলক মিলে যে জটিল যৌগাদি উৎপন্ন করে [যথা : AlFx, বিশেষ করে AlF3(OH)–] তারা ফসফেট অনুকারী (phosphato mimic) এবং সেগুলি রক্ত বাহিত হয়ে মস্তিষ্কে কতকগুলি প্রোটিন ও এনজাইমের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে সঙ্কেত প্রেরণে বিঘ্ন ঘটায়, যা অ্যালজাইমারের অন্যতম কারণ, এটাতো অনেক বিজ্ঞানী দেখাচ্ছেন। আমার বক্তব্যের ভিত্তি জানতে চাইলে আমি তাঁক নিচের দুটি নির্দেশিকা পাঠাই:

i. Christopher Bryson : the fluoride deception, 2004 (pp 226)
ii. National Research Council (USA) : Flouoride in Drinking Water : A Scientific Review of EPA's Standards, 2006 (pp 219-20)। সাহেব আমার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে ওগুলো দেখবেন লিখেছেন। তাঁর থেকে একটা তাৎপর্য্যপূর্ণ সংবাদ পেলাম। তা হক্সল 1987 সাল থেকে কিংস কলেজে কেমিস্ট্রি উঠে গেছে। ওদেশের ছেলেমেয়েরা কেমিস্ট্রির মত বিষয়কেও অপছন্দ করছেন, না রাসায়নিক শিল্পজাত দ্রব্যাদির মানুষ ও পরিবেশের উপর কুফল দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেমিস্ট্রিই পরিত্যাগ করছে? নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের জনপ্রিয়তাও আজ কমে গেছে। কিন্তু কেমিস্ট্রির আশীর্বাদের দিকটাও তো উপেক্ষণীয় নয়। সমগ্র রসায়ন শিল্পই তো আর ভূপাল, 'ডার্টি ডজন', ডাইঅক্সিন, পিসিবি, সি.এফ.সি, থ্যালিডোমাইড নয়। সব জায়গাই আই.টি দিয়ে ভরে দিলে চলবে?

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে মনে হয় অ্যালঝাইমার থেকে সাবধানতা অবলম্বনের একটা উপায় হ'ল এলুমিনিয়ামের পাত্রে রান্নাবান্না না করা বা ঐ ধাতুপাত্রে না খাওয়া, বিশেষ করে সেখানকার জলে যদি সামান্যতমও (20-200 পিপিবি) ফ্লোরাইড থাকে।

মুস্কিল হচ্ছে জীবানু, এমনকি আর্সেনিক সনাক্তকরণও আজকাল অনেক সহজ হয়ে গেছে। আগে তো ফ্লোরাইড সনাক্তকরণ ও পরিমাপ করা রসায়ন বিজ্ঞানে সহজসাধ্য ছিল না। তবে এখন দিন বদলেছে। আয়ন সিলেকটিভ ফ্লোরাইড ইলেকট্রোড আবিষ্কৃত হওয়ায় ফ্লোরাইড পরিমাপ সহজ হয়ে গেছে।

ফ্লোরাইডের ইতিবৃত্ত :

এখন জানা গেছে ভারতের অন্ততঃ 17টি প্রদেশে ফ্লোরাইডের সীমিতমারী (endemic)। সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হল : রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্র কর্ণাটক। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, কেরালায় যথেষ্ট ফ্লোরাইড দূষণ দেখা যায়। এখন ভারতের ফ্লোরাইড মানচিত্রে যুক্ত হচ্ছে অসম এবং পশ্চিমবঙ্গও। ভারত সরকারের 2004 সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতে এখন ফ্লোরোসিসে ভুগছেন অন্ততঃ সাত-আট কোটি মানুষ। 1970 সালের আগের এক তথ্য থেকে দেখছি (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা) পাঞ্জাবে ফ্লোরোসিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ। এরা সবাই গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, দুর্বল শ্রেণীর মানুষজন। তাঁদের আর্থিক বা রাজনৈতিক শক্তি কিছুই নাই। তাই তাঁরা দীর্ঘদিন অসহায়ভাবে রোগভোগ, যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে মৃত্যুর পর মুক্তি পান।

ভারতে ফ্লোরাইড বিষক্রিয়ার আবিষ্কার 1930 এর দশকের প্রথমদিকে। আবিষ্কারক হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী নালগোণ্ডার চাষীরা, অবশ্যই না জেনে, অনেকটা যেন বসন্তের টীকা আবিষ্কারের এডওয়ার্ড জেনারের গয়লানিদের মতন। চাষীরা দেখতেন বলদ চাষ করতে করতে আর টানতে পারছে না, মাঠে শুয়ে পড়ছে। আর উঠতে পারছে না। নতুন গরু এনে চাষ করতে গেলেও তাদেরও পরে হত একই হাল। ক্রমে আঞ্চলিক মানুষজনদের ভিতরও অনুরূপ ব্যাপার দেখা যেতে আরম্ভ করল। এইসব ঘটনার কথা সাহেব ভেটেরেনারি ডাক্তার সর্টের কানে গেল। তিনি তাঁর ভারতীয় সহকর্মীদের নিয়ে এই অজানা রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে ফ্লোরাইড বিষক্রিয়া আবিস্কার করলেন। নালগোণ্ডা অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক, ভূরাসায়নিক বৈশিষ্ট্যাদির জন্য সেখানকার ভূতল জল, উদ্ভিদ ঘাস মাটিতে অত্যধিক ফ্লোরাইড আসে। মানুষ ও গবাদি পশুদের ভিতর ফ্লোরোসিসের কারণ ঐসব ফ্লোরাইড। ভারত থেকে প্রকাশিত ফ্লোরাইডের উপর প্রথম বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ সেই 1937 সালে, সর্ট ও সহকর্মীদের দ্বারা। ভারতে তারপর ফ্লোরোসিস নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, হচ্ছেও। কিন্তু আক্রান্ত মানুষজনদের সুরক্ষা ও চিকিৎসা খুব এগোয়নি, যদিও আমাদের দেশ চাঁদে মানুষ পাঠাবার ব্যবস্থা করছে। নালগোণ্ডায় অনেকদিন থেকেই জল থেকে ফ্লোরাইড দূর করে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যাল স্কেলে হচ্ছে। তাতে রাসায়নিক তঞ্চণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। পৃথিবী বিখ্যাত এই প্রযুক্তিকে নালগোণ্ডা টেকনোলজি বলে।

নসীপুরে একদিন :

বীরভূমের নলহাটী ষ্টেশন থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে গেলে নসীপুর, ভবানন্দপুর, গ্রামগুলি ফ্লোরোসিসের সীমিতমারী অঞ্চল। সত্তরের দশকের শেষদিকে জীবানুমুক্ত নিরাপদ

জলসরবরাহের জন্য সরকার থেকে এখানে নলকুপ বসানোর পর থেকেই এইসব অঞ্চলে ফ্লোরোসিসের সমস্যা সৃষ্টি হয়। ঠিক আর্সেনিকের মত। কয়েক বছরের মধ্যেই ফ্লোরাইডের মারণতাণ্ডব দেখা যায়। আগে লোকে ঝর্ণা, নদী, পুকুর, 'সী-পেজ' থেকে জল ব্যবহার করত। তাতে জীবানুঘটিত রোগভোগ কখনো হলেও ফ্লোরোসিস ছিল না। নসীপুর গ্রামের নাম পদবীতে বয়ে গেলেন আমাদের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক ধনঞ্জয় নসীপুরী, বিখ্যাত জৈব রসায়নবিদ, যিনি আমাদের সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে খড়গপুর আই.আইটিতে ছিলেন। এখন ঐসব অঞ্চল থেকে ধনঞ্জয় বাবুর মত বিদ্বান বুদ্ধিমান আর কেউ হবেন না। যাঁরাই পেরেছেন তাঁরাই ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করে সহরে গিয়ে বাস করছেন। তাছাড়া জলের ফ্লোরাইড যে আর্সেনিকের মতন শিশুদের মেধা বিনষ্টির কারণ তা সাম্প্রতিক বিজ্ঞান গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফ্লোরাইড স্নায়ুতন্ত্র বিষক (neurotoxic) এবং এলুমিনিয়ামের উপস্থিতিতে অ্যালঝাইমার রোগের কারণ।

শিল্প বর্জ্য নিষ্পত্তির অপূর্ব আমেরিকান উদ্ভাবন

লেখা বড় হয়ে যাচ্ছে। তাই জোর করেই সংযত হতে হচ্ছে। তবে একটা ধাঁধার উত্তর না দিলে বিওবি'র পাঠকরা ছাড়বেন না। ধাঁধাটি হ'ল এই :

ফ্লোরাইড যদি এতই খারাপ তবে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার মত দেশে কেন জলের ফ্লোরিডেশান করা হয়? অর্থাৎ পরিকল্পিত ভাবে বাইরে থেকে ফ্লোরাইড যোগ করা হয়? ই.পি.এ'র সুপারিশ হ'ল লিটারপ্রতি জলে 4 মিগ্রা পর্য্যন্ত। বিশ্বসংস্থার আশ্চর্য্য সুপারিশ হ'ল লিটারপ্রতি 1.5 মিগ্রা। ভারত সরকারের 1.0 মিগ্রা। টুথপেস্টেও কেন ফ্লোরাইড যোগ করা হয়? দন্ত চিকিৎসাতেও ফ্লোরাইডের ব্যবহার প্রচলিত।

কলগেট টুথপেষ্টে দেওয়া হয় সোডিয়াম মনোফ্লোরো ফসফেট। আর প্রোক্টর অ্যাণ্ড গ্যাম্বল কোম্পানীর ক্রেষ্ট টুথপেষ্টে দেওয়া হয় স্ট্যানাস ফ্লোরাইড। ফ্লোরাইড নাকি দাঁতের সুরক্ষা করে, এমনিই বিজ্ঞাপন। আমেরিকার পানীয় জলে দেওয়া হয় ফ্লোরোসিলিকেট। আমেরিকায় সরকার আবার দাবী করেন, সদম্ভে ঘোষণা করেন যে সংক্রামক রোগনিবারণের জন্য ভ্যাকসিন বা টীকার ব্যবস্থা করা ও ফ্যামিলি প্ল্যানিংএর প্রযুক্তির সাথে জলের ফ্লোরিডেশন আমেরিকার বিংশ শতাব্দীর 10 টি বৃহত্তম জনস্বাস্থ্য রক্ষার কীর্তি সমূহের অন্যতম। এ বিষয়ে যথাযোগ্য উত্তর বা ব্যাখ্যা নিচের কয়েক লাইনেই সেরে প্রবন্ধের সমাপ্তি টানছি।

আমেরিকায় কতকগুলি কর্পোরেট সেক্টরের আছে বিশাল বিশাল রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, যা তাদের বিরাট মুনাফার উৎস, আর আমেরিকার অর্থনীতি রাজনীতির ভিত্তির অনেকটাই।

সেই তিনটি শিল্প হক্সল : ফসফেট সার, এলুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন (এয়ারক্র্যাফট শিল্পের জন্য যা অত্যাবশ্যক); আর পরমানু জ্বালানি ইউরেনিয়াম - 235 প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড উৎপাদন।

এই তিনটি শিল্প থেকেই বিপুল পরিমানে ফ্লোরাইড বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার সুষ্ঠ নিষ্পত্তির আজো কোনো সন্তোষজনক সমাধান নাই। ফ্লোরাইড যেহেতু একটি মৌলিক পদার্থ, যার সৃষ্টি নাই, বিনাশ নাই, তার নিষ্পত্তির কোন ব্যবস্থা হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়। নদীতে, সমুদ্রে, লেকে, ভূগর্ভে এত ফ্লোরাইড ফেললে পরিবেশ আন্দোলনকারীরা বিষম সোরগোল বাধায়। তাই তাদের আন্দোলনের মূল ভিত্তিকেই নষ্ট করে দেবার জন্য অপবিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে পানীয় জলে শিল্পজাত ফ্লোরাইড নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হল। জলে ফ্লোরাইড, টুথপেষ্টেও ফ্লোরাইড দিয়ে মানুষের ফ্লোরাইড ভীতি কমিয়ে তাকে গ্রহণীয় করে তোলার ব্যবস্থা হ'ল। ফ্লোরাইড বর্জ্য আর পরিবেশে না ছড়িয়ে অল্প অল্প করে মানুষ ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহে সঞ্চয় করে কবরস্থ করার চমৎকার স্থায়ী ব্যবস্থা হ'ল। বর্জ্য নিষ্পত্তির অপূর্ব আমেরিকান উদভাবন। লক্ষণীয় ফ্লোরিডেশন শুরুর কাল : 1945 সাল, অ্যাটম বোমা ফাটানোর ঠিক পরেই।

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি চিনে এসব নিষিদ্ধ, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্সেও চলে না। অন্যান্য কিছু দেশে জল ও টুথপেস্টে ফ্লোরাইড যোগ করার শুরু ও বন্ধ করার কাল দেখানো হ'ল।

দেশের নামের পাশে শুরু ও বন্ধের বৎসর দেখানো হক্সল।

জাপান	:	1952-72
নেদারল্যাণ্ড	:	1953-76
জার্মানি	:	1952-71
চেক প্রজাতন্ত্র	:	1958-88
সুইডেন	:	1952-71
ফিনল্যাণ্ড	:	1959-63

আমেরিকায় এখন যে পরিমান ফ্লোরাইড বিরোধী বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, শক্তিশালী জনমতও তৈরি হয়েছে, সেখানে আর বেশিদিন ফ্লোরিডেশান চালানো যাবে মনে হয় না। তাহলে আমেরিকার এয়ারক্র্যাফট শিল্প, পরমানু শিল্প, টেফ্লন, নার্ভ গ্যাস, পেষ্টিসাইড ইত্যাদি শিল্পের কি হবে? থাকবে কি আমেরিকার 'সুপার পাওয়ার' মর্য্যাদা?

ব্যতিক্রমী কিছু পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা

□ নিউক্লিয়ার বোমানয় □ রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ঘোষণা

□ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষাপরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ

□ পরিবেশ আইন-কানুন □ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান

□ বিজ্ঞান সমাজ মানুষ □ পরিবেশবিদ্যা পরিচয়

□ পরমাণু চুক্তি নয় - বিকল্প শক্তিই ভরসা

পাওয়া যাবে দুহাজার নয় -এর কলকাতা বইমেলায় বিওবি-র স্টলে ও অন্যত্র।

বিওবি-তে আপনাদের মতামত, চিঠিপত্র, লেখা ইত্যাদির জন্য ডাকযোগে এবংক্তঅথবা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (সাড়ে ছটা-সাড়ে আটটা)
২/১ এ আশুতোষ শীল লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

ওষুধ, ওষুধের দাম, চিকিৎসা ও অসুখীমানুষ

উত্তান বন্দোপাধ্যায়

চিকিৎসা - নৈতিকতা অনৈতিকতা - অনাচার

চিকিৎসা সংকটের আলাদা কোন আকাশ নেই। আর এই সংকটটাও অতীব জটিল, অমানবিক। যেন বেঁচে থাকাটাই এখন এক যন্ত্রণা হয়ে আছে। বর্তমানের বিশ্বায়ণ বা ভূবনীধারণা কতগুলো আগেকার বোধকে আমূল বদলে দিয়েছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ দায়কে এখন অস্বীকার করা হচ্ছে। পরিবর্তে বাজার নির্ভর অর্থনীতি রাষ্ট্র ব্যবস্থার নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি আজ নাগরিকদের কাছে বর্ষিত হয়েছে - পাওয়া গেছে অনাবশ্যক ঝুঁকি আর অনিরাপত্তার জীবন, জীবিকা, বাঁচা আর মরা। মানুষের অন্যান্য প্রয়োজনের সঙ্গে চিকিৎসার উপযুক্ত সুযোগ যে আবশ্যিক অঙ্গ আজ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এটাতো গেল একটা দিক, সবচেয়ে মজা হলো যে পুঁজি এক্ষেত্রে এমন অমানবিক যে বড়োলোকতান্ত্রিকতাও সে ভুলে যায়। চিকিৎসা সংকটে পড়ে বড়োলোকেরাও, তখনই সে অসহায় - সে গরীরবই হোক আর বড়লোকই হোক - যখন সে রোগী বা অসুস্থ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে পুঁজির মুনাফা যখন বাড়ে সে তখন রোগীটির অর্থনৈতিক অবস্থান ভুলে যায় বা কেয়ার করে না। তাই চিকিৎসায় অনাচার বড়লোকেরও হয়। কিন্তু জ্ঞানতত্বের মজটাটা হলো ডাক্তারবাবু তো আর ভুল চিকিৎসা করেন নি কারণ তিনি যে চিকি ৎসাটা করেছেন তা তথ্য নির্ভর চিকিৎসা বা এভিডেন্স বেসড্ মেডিসিন (ই. বি. এম) অর্থাৎ 'বিজ্ঞান'। একটা ক্ষমতার খেলা বা ক্ষমতার আড়ালে 'বিজ্ঞান' নাম নিয়ে একটা খেলা। কিন্তু ম্যাজিকটা এখানেই যে এতদসত্ত্বেও প্রথম এ প্রশ্নটা সোজাসুজি এসে দাঁড়িয়েছে, যে চিকিৎসার অনাচারের পিছনে যদি ব্যবসার অনৈতিকতা কিছু থেকেও থাকে তবু বিজ্ঞান কি সবসময় নৈতিকতা মেনে হয়? সে কি নিরপেক্ষ? চিকিৎসা বিজ্ঞান বনাম নৈতিকতার ভিতরেই লুকিয়ে আছে চিকিৎসা শাস্ত্রের সংকট। সবচেয়ে বড়ো কথা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বলা হয় ইনএক্স্যাক্ট সায়েন্স। এখানে দুই-এ দুই-এ চার হয় না। লজিকটাই ইনএক্স্যাক্টনেস। আর তাই, ডাক্তার ভুল করলেও ভুল ধরিয়ে দেবার রাস্তার থেকে ডাক্তারের অব্যাহতির রাস্তাটা অনেক বড়ো। ডাক্তারদের রেগুলেট করার আইনগুলো পড়লেও বোঝা যায় যে চিকিৎসককে অভিযুক্ত করার রাস্তা খুব কম আর রাস্তা থাকলেও তা প্রমাণ করা খুবই দুঃসাধ্য। তারা যেটা করেন সবক্ষেত্রেই তার যুক্তি হলো তারা তো বিজ্ঞানটাকেই ব্যবহার করছেন!

চিকিৎসায় দুর্বৃত্তায়ণ - উদাহরণ

আজকের চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে ওষুধ-বিষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা -নির্ণয়, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম এবং সরকারী বেসরকারী হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের খরচ খরচা সব কিছু যোগ হয়ে চিকিৎসা খাতে খরচের মাত্রা শতকরা ৭০ জন মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। যাদের আয়ত্তের মধ্যে আছে তাদের বহু আড়ম্বরে চিকিৎসা দিতে হয় নার্সিংহোমের লাভ তোলার জন্য। তাই যেটা দরকার নেই সেটা করতে হয়। আর লজিকও তৈরী করতে হয়। ধরা যাক্, পায়ের আঙুল ভেঙেছে। মেডিক্লেম আছে ৫ লক্ষ টাকার। এখন যদি ৫ লাখ টাকাটাকে খরচ দেখাতে হয় তাহলে লজিক তৈরী করতে হবে। ICCU তে পাঠাতে হবে। ভোভেরান ইঞ্জেকশন আই . ভি. দিতে হবে (ধরা যাক)। র‍্যানট্যাক দিতে হবে না একবেলা, এপিগ্যাসট্রিক পেইন হবে - আরজেন্ট ই. সি. জি হলো- খারাপ, অ্যাঞ্জিওগ্রাম - খুব খারাপ। ব্লকেজ। পি. টি. সি. এ. বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ। এরকম শয়ে শয়ে গল্প আছে। অপারেশন টেবিলে ধেড়িয়ে দিয়ে বেড হেড টিকিট (BHT) - এ নানারকম ভাবে ডক্টরিং করারও নমুনা আছে। চিকিৎসার অনাচার আর গাফিলতি আলাদা দুটো কথা। গাফিলতি আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আমেরিকাতেও আছে, সুইডেনেও আছে, ইংল্যান্ডেও আছে, রাশিয়া, চীন, কোরিয়া সর্বত্রই আছে। যেমন ধরা যাক মিস্‌ম্যাচড্ ট্রান্সফিউশন -- এটি হচ্ছে এক গ্রুপের রক্তের বদলে অন্য গ্রুপের রক্ত যদি শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকে যায় তাতে যে শারীরিক

ক্ষয় ক্ষতি বা ব্যাধি হয় তাকেই বলা হয়। এটি গাফিলতি। এটির কথা হ্যারিসন, ডেভিডসনের বইতেও লেখা আছে। কিন্তু অনাচার? অনাচারের পিছনে অশুভ ব্যবসা জড়িত। মুনাফা জড়িত। দুর্বৃত্তায়ণ জড়িত। ল্যাপারোস্কপিক কোলেসিস্টেকটোমিতে বা ল্যাপকোলিতে (যদি গলস্টোন হয় বা কোন কারণে গলব্লাডার বাদ দিতে হয়) গলব্লাডার বাদ দেবার পরে কমন হেপাটিক ডাক্ট্-এর কাছে আড়াআড়ি ভাবে ক্লিপিং করার বদলে যদি মাঝখানে ক্লিপিং করা হয় তাহলে পিত্ত আর আসবেই না। অবস্ট্রাকটিভ্ জন্ডিস হয়ে রোগী মারাও যেতে পারে যদি না পেট কেটে ল্যাপারোটমি বা ওপেন অপারেশন করা হয় সাথে সাথেই। কিন্তু ডাক্তারবাবু তো ল্যাপারোস্কোপিক সার্জেন, পুরো পেটকাটার সার্জেন নন বা অভ্যেস নেই। আবার ডাক্তার অন্য কোন 'ওপেনক্স সার্জেন কে ডেকেও আনতে চাইছেন না কারণ তার ধ্যাড়ানোটা যদি ধরা পড়ে যায় অন্য বিশেষজ্ঞের কাছে! সে ডাকলোও না চেপে গেলো - বি. এইচ টি. তে উল্টোপাল্টা লিখলো। কমপ্লিকেশন বাড়তে থাকলো। রোগী কয়েকমাস ভুগলো। অবশেষে মারা গেল। ধার দেনা বাড়ী ঘর বিক্রি করে খরচা হলো সাত লক্ষ। বলা বাহুল্য নার্সিংহোম ও ডাক্তার পুরো টাকাটা নিয়ে নিলো। এটা নাকি তাদের প্রাপ্য। এটা গল্প নয়। যদিও সবক্ষেত্রেই এটা হয় - বলা যায় না, তবে এঘটনা বিরল নয়। চিকিৎসা এখন এইভাবে ক্রিমিনালিটির আওতায় চলে গিয়েছে। রোগীরা যে খরচা করেন তার যৌক্তিকতা কতটা? কতটা আবশ্যিক বা অনাবশ্যিক? এছাড়া ওষুধের জগত তো আছেই। ওষুধের ট্রায়াল চলাকালীন ওষুধের পরীক্ষা করা, রোগীকে না জানিয়ে-এ আখছার আমাদের দেশে হয়ে চলেছে। প্রচুর কম্বিনেশন ড্রাগ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে - ডাক্তারেরাও লিখছেন।

আমাদের দেশে ওষুধের দামের ব্যবস্থা - সরকারের ভূমিকা

প্রয়োজনীয় ওষুধের ক্ষেত্রে দাম হচ্ছে সবচেয়ে প্রতিবন্ধক আমাদের দেশে। কারণ, রোগের চিকিৎসায় ওষুধ ও রোগ নিরূপণের পরীক্ষার জন্য খরচ সবচেয়ে বেশী করতে হয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষ সবার উপরে। এদেশে সরকার (সরকারী সমীক্ষা অনুযায়ী) মানুষের মোট চিকিৎসার ১৭ শতাংশ বহন করে আর ৮৩ শতাংশ বহন করে মানুষ নিজে। রোগীর জীবন বাঁচাবার জন্য মানুষ মরীয়া হয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়, এ উদাহরণ প্রচুর। আবার, অসংখ্য মানুষ আছেন যারা অচিকিৎসিত-ই থাকেন কারণ তারা ওষুধ কিনতে পারেন না। এরকম একটা অবস্থায় আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে ওষুধের দাম নিয়ে আলোচনা করতে পারি। শোনা গেছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাতেই ২০০৪ সালের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে আমাদের দেশের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করেন। যাইহোক, পেট্রল - ডিজেলের দামের মতন জানিয়ে বাড়েনা ওষুধের দাম। ওষুধের দাম নিঃশব্দে বেড়ে যায়। কিন্তু মানুষকে তো ওষুধ কিনতেই হবে। এটাও জানা গেছে যে ধনী দেশগুলি যেমন অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকা, ইউরোপ, জাপানে তাদের সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের দেশে জোরালো সেরকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই।

ওষুধের দাম ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৭৮ সালে সরকার হাতি কমিশন সুপারিশ করে এবং প্রথম জাতীয় ওষুধ নীতি গৃহীত হয়। ১৯৭৯ সালে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ জারি হয়। মোট ৩৮৭ টি ওষুধের প্রয়োজনীয় ওষুধ হিসাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর একটু আগের ইতিহাস ছিল অন্যরকম। ১৯৭০ সালের আগে মূলতঃ গ্লাক্সো, হেক্সট্, এম এস ডি, স্কুইড এই সমস্ত বিদেশী কোম্পানীর হাতেই ছিল ওষুধের গোটা বাণিজ্য। ১৯৭০ সাল থেকে তৈরী হলো প্রসেস পেটেন্ট ব্যবস্থা। '৭০ সালের পরে ধীরে ধীরে তৈরী হলো আই ডি পি এল বা হিন্দুস্তান এ্যান্টিবায়োটিকস্ লিমিটেড। তারা বাল্কড্রাগ এবং মূলতঃ এ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করতে শুরু করল। এবং এই মৌল ওষুধগুলো রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেস এর নামে প্র্যাকটিক্যালি কারিগরিকে 'টুকলি' করে তার মাধ্যমে অর্থাৎ অন্যরকম উপায়ে ওই মৌলটিকেই উৎপাদন করার মাধ্যমে মৌল ওষুধ তৈরী করে অন্যান্য ওষুধের কোম্পানীকেও বিক্রি করতে শুরু করে দিল। তারপরেই আস্তে আস্তে ১৯৭৮ সালে হাতি কমিশনের রিপোর্ট এবং প্রথম ওষুধ নীতি। যাই হোক তাহলে দেখা যাচ্ছে যে

৩৮৭ টি ওষুধ প্রথম ১৯৭৯ সালে মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা হয় অর্থাৎ সরকারের বেঁধে দেওয়া দামের বেশী দামে ওই ওষুধগুলো আর বিক্রি করা যাবে না।

ফর্মূলা, আইনের সুযোগে ভুজুং ভাজুং

সেইসময় ওষুধের দামের জন্য একটা সূত্র তৈরী করা হয়। সেটি হলো

ওষুধের খুচরো মূল্য = (কাঁচা মালের মূল্য + প্যাকিং এর মালের মূল্য + প্যাকিং এর খরচের মূল্য + উৎপাদন প্রক্রিয়ার খরচের মূল্য) X $(১ + \frac{\text{লাভের মাত্রা}}{১০০})$ + উৎপাদন কর।

এই ফর্মুলাটা আজও চলছে। ধাপে ধাপে সরকার ৩৮৭টি ওষুধকে কমাতে কমাতে ১৯৯৫ সালে মাত্র ৭৪টি ওষুধের ক্ষেত্রে দামের নিয়ন্ত্রণ রেখে এবং লাভের মাত্রা ১০০ শতাংশ করা হয়েছে। তার মানে এই সূত্রটি প্রয়োগ করে উৎপাদন মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য ওষুধের দাম ধার্য করা যাবে। এতো বেশিহারে লাভের অনুমতি কিন্তু অন্য কোন দেশে দেওয়া হয় না, বিশেষত মূল্য নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রে। এখনও আমাদের দেশে ওই একই সংখ্যায় অর্থাৎ ৭৪টি ওষুধই কনট্রোলড প্রাইসে বা মূল্যে নিয়ন্ত্রণাধীন। ২০০৪ সালে ডব্লু. টি. ও-র প্রেসক্রিপশনে আবার শুরু হলো প্রডাক্ট পেটেন্ট ব্যবস্থা। বেড়ে গেলো ওষুধের দাম হু হু করে। নিয়ন্ত্রিত ওষুধের দামগুলোর ক্ষেত্রেও কোম্পানীগুলো নিজেদের ইচ্ছে মতন দাম ধার্য্য করছেন। কিভাবে? যে মৌলটি যে বেস্-এ থাকলে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব সেই মৌলটি সেই বেস্-এ না রেখে বেস্ পাল্টিয়ে ড্রাগ এ্যান্ড কসমেটিকস্ অ্যাক্ট অনুযায়ী বেস-টিকে ওষুধ না বানিয়ে (মৌলটি একই রেখে) ফুড-সাপ্লিমেন্ট বানিয়ে অর্থাৎ কারিগরী ভুজুং ভাজুং দিয়ে দামটাকে বাড়িয়ে দেওয়া। অনেক কোম্পানী ইদানিং এইচ টু ব্লকার ফেমোটিডিন কে ট্যাবলেট আকারে না রেখে জেল আকারে বিক্রি করছে। ফলে নিয়ন্ত্রণ নেই, জেল আকারে বিক্রি করলে। তখন এটা 'ওষুধক্স থাকছে না - হয়ে যাচ্ছে ফুড সাপ্লিমেন্ট। দামের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হলো না। একটা ফেমোটিডিন ৪০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেটের দাম যদি ৪০ পয়সা হয় ওটার অনুরূপ ১০ এম-এল জেলের দাম হয় তার ১০গুণ বেশী অথচ উৎপাদন খরচ প্রায় একই। ১৯৭০ দশকের আগে ছিল বিদেশী কোম্পানীদের হাতে ওষুধের বাজার। বর্তমানে বেশ কিছু দেশীয় পুঁজিপতি চুটিয়ে টেক্কা দিচ্ছে বিদেশী কোম্পানীদের সাথে। তারমধ্যে অন্যতম হলো সান ফার্মাসিউটিক্যালস্। ৮০ দশকের প্রথমে সান ছিল একজন ডিসট্রিবিউটর। কলকাতার ব্যবসায়ী। বর্তমানে সানের মোট পুঁজি প্রায় আঠার হাজার কোটি টাকা। এম. আই. এম. এস্ নামে একটি সমস্ত ওষুধের পঞ্জিকার সম্পাদক ডাঃ মোহন গুলাটি সম্প্রতি একটি সভায় একথা বলেছিলেন। সত্তর দশকে কেউ কেউ রাজপথে দুধ বেচতো এখন সে ওষুধ কোম্পানীর মালিক। তার পুঁজি প্রায় হাজার কোটি টাকার উপর, কি করে হয়? কেমন ভাবে হলো? নিশ্চই ওষুধের মুনাফা করে। কি লাভ হলো তাহলে দামের নিয়ন্ত্রণ করে? যদিও নিয়ন্ত্রিত মৌল ওষুধ মাত্র ৭৪ টি, এখনও। মোটামুটি ৭০০ টির মত মূল ওষুধ দিয়ে এদেশের অধিকংশ ওষুধ তৈরী হয়। সুতরাং বিপুল সংখ্যক ওষুধ মূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেক্ষেত্রে দামের কোন সীমা নেই। আমরা এফ. এম. আর. এ. আই এর কাছ থেকে যে তালিকা সংগ্রহ করি তার অংশ একটু তুলে ধরতে চাই যে নিয়ন্ত্রিত ওষুধের মূল্য বেড়েছে কিভাবে —

	ওষুধের নাম	কি ধরনের ওষুধ	প্যাক	১৯৯৮ সাল দাম	২০০৭ দাম	বৃদ্ধিশতাংশে
১।	আরসেনিক্স জেড	টিউবারকুলোসিস-এর ওষুধ	১০টির ট্যাব	৭.৭৮	৫১.৫৪	৫৬৬.৪৫
২।	হিউম্যান অ্যাক্টোপিড	ইনসুলিন	১০ মিলি ইঞ্জে	১৭৬.৮০	৫০৬.১৫	১৮৬.২৮
৩।	ওভরাল - এল	জন্ম নিয়ন্ত্রণের	২১ টির ট্যাব	১৪.২০	৬১.৯৫	৩৬৬.২৭
৪।	এনাম	হৃদরোগের	২.৫ মিঃগ্রাম১০টি	৮.১১	১৭.৩৩	১১৩.৬৯
৫।	মেবেক্স	কৃমির জন্য	১০০ মিলিগ্রা ৬টি	৮.৯০	১৬.০০	৭৯.৭৮
৬।	ফিফল	রক্তাল্পতার	১৫টি	১৪.৮৬	৩৫.২১	১৩৬.৯৪

(টাকার অবমূল্যায়নের ব্যাপারটিকে 'চলক্সরাশি ধরেও বাল্ক ড্রাগের দাম কমেছিল বাজেটে।)

অথচ নিয়ন্ত্রিত ওষুধের দাম বাড়ার কথাই নয় বরং কমার কথা। বিশ্বের বাজারে চীন যবে থেকে মৌল ওষুধগুলি, যা থেকে ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সিরাপ, ইঞ্জেকশন তৈরী হয়, বৃহদাকারে রপ্তানি করতে শুরু করে বিশ্বের বাজারে তখন থেকেই দাম পড়তে শুরু করে। আমাদের দেশেও বহু মৌল ওষুধ উৎপাদন করা হয়। সরকার যে সমস্ত মৌল ওষুধের (৭৪টি) মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন তা ধার্য্য দামের চেয়ে অনেক কম দামে মৌল ওষুধ খোলা বাজারে পাওয়া যায়। তা স্বত্ত্বেও নিয়ন্ত্রত ওষুধের মূল্য বাড়ে কি করে? এটা একটা মূল্য নিরূপণে প্রতারণা।

ওষুধ মুনাফায় নানান ধাঁচে হোয়াইটকলারড্ দুর্বৃত্তায়ণ

যেগুলো অনিয়ন্ত্রিত মূল্যের ওষুধ সেগুলো যে প্রয়োজনীয় ওষুধ নয় তা কিন্তু নয়। ফলে একই ওষুধ বিভিন্ন দামে যে যা পারছে এক অভব্য মুনাফাবাজদের নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে। এবার আলোচনা করা যাক কিভাবে হোয়াইট্কলারড্ দুর্বৃত্তায়ণ ঘটে যায় ওষুধের দাম নিয়ে। একই ওষুধের বিভিন্ন দাম হয় কিন্তু বিশাল পার্থক্য হয় কি ভাবে? একই ওষুধ বিভিন্ন ব্রান্ড নামে বিভিন্ন কোম্পানী বিক্রি করে। সর্বনিম্ন মূল্যের ওষুধে যিনি বিক্রি করছেন তিনিও লাভ করছেন, তাহলে সর্ব্বোচ্চ মূল্যের ব্রান্ডটির দাম এতো বেশী হয় কিভাবে? উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। 'রেম্পেরিডোলক্স এটি ট্যাবলেট টরেন্ট কোম্পানী বিক্রি করে ১টাকা ৬৯ পয়সায়। এথনর একটি ট্যাবলেটের দাম নেয় ২৭ টাকা ৩০ পয়সা। দামের পার্থক্য শতাংশ কত? ১৪৯৭.৬৩ শতাংশ। অ্যামলোডিপিন উচ্চরক্তচাপ বৃদ্ধিকে প্রশমিত করে। ম্যানকাইন্ডের ১০টা ট্যাবলেটের দাম চার টাকা আর ফাইজার কোম্পানী একই ওষুধ ৬৬ টাকা ৯৬ পয়সা। সেট্রিজিন (১০ মিলিগ্রা) একটি অ্যালার্জি প্রশমন করার ওষুধ। মেডলে কোম্পানীর ১০ টি ট্যাবলেটের দাম ১০ টাকা, গ্লাক্সোর ৩৩ টাকা ৬৫ পয়সা। একটি অ্যান্টিবায়োটিক লিভোফ্লক্সাসিন। সিপলা কোম্পানীর ১টি ট্যাবলেটের দাম ৬ টাকা ৮২ পয়সা, অ্যাভেন্টিস কোম্পানীর দাম ৯৫ টাকা।

এফিকেসি? নাকি... আরেকটা 'ঠুলি' ! তাহলে কি জেনেরিক? .....ওষুধের ডিসট্রিবিউশন সার্কিট

এ ধরনের অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু বিপণন কর্মীদের শিখিয়ে দেওয়া হয় যে ডাক্তারদের কাছে গিয়ে দামী ওষুধটি (অন্যান্য কোম্পানীর ওষুধের তুলনায়) প্রমোশন করতে গিয়ে যেন বলে- রিসার্চ প্রডাক্ট এটি। মানে, যেন প্রথম বাজারে এরাই এই ওষুধটি নিয়ে এসেছিল এবং এদের ওষুধের যে প্রসেস কোয়ালিটি তার কার্যকারিতা বা এফিকেসি সবচেয়ে ভাল। এটি একটি ফালতু তত্ত্ব। ড্রাগ কন্ট্রোল জেনারেল অফ্ ইন্ডিয়া প্রত্যেকটি ওষুধের বিপননের জন্য মনোনয়ন দেয়। পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই দেয়। তাহলে? ফার্মাকো কাইনেটিক্স নাকি প্রসেস বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য অনেকটাই নির্ভর করে। উৎপাদন প্রক্রিয়া যদি একটু কমপ্রোমাইজড হয় তাহলে নাকি এফিকেসির এদিক ওদিক হয় কিন্তু পুরোমাত্রাতেই নাকি ওষুধটি থাকে। কোন বিজ্ঞানে একথা বলে কে জানে। যদি তা হয়ও তাহলে ডি. সি. জি. আই এইসব ওষুধগুলোকে একইসাথে অনুমোদন দেয় কি করে? তাহলে কি ওষুধকে বাজারে নামানোর জন্য ডি. সি. জি. আই এর কোন অফিসারকে ঘুষ দিতে হয়? হয়তো তাই। হয়তো তা নয়। যাইহোক এই ওষুধের ধরণের দামের ফারাকের অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। অদ্ভুত ব্যাপার, যে সব ওষুধ সবচেয়ে বেশী চলে তার দাম সর্বাধিক। আরো অদ্ভুত ব্যাপার- তা সত্ত্বেও সরকার সর্বাধিক প্রচলিত ওষুধের দামকে দৃষ্টান্ত রেখে অন্য ব্রান্ডের ওষুধের মূল্য নিরুপণ করেন। ওষুধের দাম নিয়ে প্রচুর কথা বলা যায়। যে ব্রান্ড সবচেয়ে কমদামে যে কোম্পানীটি বিক্রি করে সেটা কি কমদামী কোম্পানী? মোটেই না। ধরা যাক ম্যানকাইন্ড কোম্পানী প্রথম ১৫টা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর একটা। জার্মান মেডিকোস কোম্পানীও সস্তায় বহু ওষুধ বিক্রি করে। এদের বিভিন্ন ধরনের মার্কেটিং পলিসি। ডিসট্রিবিউটারদের একরকম কমিশন দেয়, রিটেলারদের আরেকরকম কমিশন। ডাক্তারদের প্রমোশনের জন্য নানান ধরনের উপঢৌকনের ব্যবস্থা থাকে। ব্যবস্থা থাকে তাদের বিদেশ ভ্রমণের। সবটাই কোম্পানী গুলো তুলে নেয় সাধারণ মানুষের পকেট কেটে। এ্যমলোকাইন্ড ওষুধটি কম দামী স্ট্যামলোর থেকে। এমলোকাইন্ড কমদামে ছেড়ে বেশী বিক্রি করতে চায় -- অনেক বেশী। যাতে অনেক বড়ো বাজারটা পাওয়া যায়। স্ট্যামলোর বাজারও ভাল, কাজেই ডাক্তারদের হাত

করাটা হলো সবচেয়ে বড়ো কাজ। এনিয়ে প্রচুর নোংরামি চলে। ধরে নিই আরেকটি ইনজেক্টেবেল অ্যান্টিবায়োটিক 'সেরোপোনেমক্স নামে ওষুধটির কথা। অনেক কোম্পানী 'সেরোপোনেমক্স বিক্রি করে একটি ভায়াল ৩৩০০ টাকায় (এম আর পি)। এই ওষুধটি মূলতঃ সেপ্টি সিমিয়া কে প্রতিহত করার ওষুধ। এই ওষুধটি ডিস্ট্রিবিউটর দের কাছে পাওয়া যায় মাত্র ১১০০ টাকায়। অনেক সহৃদয় ডাক্তারবাবু সরকারি হাসপাতালে রোগীর বাড়ীর লোকদের বলে থাকেন ওমুক ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে চলে যান -- ১১০০ টাকায় এই ওষুধটি পাবেন। মার্কেটিং সার্কিটটাই এমন যে প্রচুর মানুষ তো এই দামে পাবেন না। আবার নাসিংহোমগুলো এই ওষুধটিই ১১০০ টাকায় কিনে বিল করে ৩৩০০ টাকা, প্রতিটি ভায়াল। এইভাবে অসুস্থ একটা জগত তৈরী হয়েছে ওষুধের। ওষুধের দামের কারচুপি বন্ধ করার জন্য সরকার ব্রান্ড নাম ছাড়াও ওষুধের কেমিক্যাল নামে বা জেনেরিক বা গোত্র নামে ওষুধ বিক্রীর প্রতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নজর দেয়। কিন্তু বাজারটা ব্রান্ড নামে ওষুধে ছেয়ে আছে - জেনেরিক ওষুধ একমাত্র হাসপাতালগুলো কেনে। সরকার কোম্পানীগুলোকে বলে জেনেরিক নামেও ওষুধ বাজারে বিক্রি করতে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। এখানেও চালাকি চলে। চলে বিরাট প্রহসন। জেনেরিক নামের ওষুধের দাম কম হয় এবং সরকারী নানাবিধ ছাড়ের ব্যবস্থা থাকে বলে সাধারণত এই সব ওষুধ সরকারী বা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গুলিতে বেশী পরিমানে (বাল্ক) কেনা হয়, এই ওষুধগুলোর তেমন প্রমোশন হয়না ডাক্তারদের কাছে। কাজেই গরীব মানুষেরা কিনতেও পারেনা কারণ ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনে তার উল্লেখ থাকে না। এই সুযোগটুকু যতটুকু আছে ততটুকুও অপব্যবহার করে ওষুধ কোম্পানীগুলো, চালু করে ব্রান্ডেড জেনেরিক ওষুধ। কি সেটা ? ওষুধের প্যাকেটে জেনেরিক নাম প্রথমে লেখা থাকলেও তার একটা অন্য ব্রান্ডেড নাম দিয়ে রাখা হয়। নির্দিষ্ট কোম্পানীর ওষুধগুলো খুচরো ব্যবসায়ী বা চিকিৎসক লিখে ঐ কোম্পানীর ওষুধটাই বিক্রি হওয়া নিশ্চিত করতে পারেন। দেখা গেল এই সব ওষুধের ক্ষেত্রে কোম্পানীগুলি খুচরো দাম রাখছে খুবই বেশী কিন্তু পাইকারী দাম রাখছে অত্যন্ত কম। এর ফলে মাঝখানের ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু যিনি ওষুধ ব্যবহার করছেন তিনি কোন সুবিধা পাচ্ছেন না। সরকার আপত্তি তুলেছিল। তাতে ২০০৬ সালে ১১টি কোম্পানী প্রায় ৮৮৬ টি ওষুধের দাম কমিয়ে দিল। কিন্তু দেখা গেলো ওই ৮৮৬ টি ওষুধের মধ্যে মাত্র ১টি বাদ দিয়ে কোন ওষুধই বিক্রির জন্য তারা প্রচার করেন না। এগুলোর ফলে কি লাভ হলো তাদের ? তারা ব্রান্ডেড ওষুধগুলোকে আলোচনার উর্দ্ধে রাখল। এন. পি. পি. এ বা ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি হলো আমাদের দেশে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করার সরকারী দপ্তরের নাম। ওষুধের কোম্পানীগুলো বিভিন্ন তথ্যের যোগান দিয়ে ওষুধের দামের অনুমোদন করিয়ে নেয় এন. পি. পি. এ-র কাছ থেকে। এন. পি. পি. এ কে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কিভাবে ? ১৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ওষুধ কোম্পানীর মালিকগোষ্ঠী এই এন. পি. পি. এ তে মেম্বার হিসাবে অংশগ্রহণ করে। ফলে এন. পি. পি. এ -কে নানা ভাবে প্রভাবিত করে ওষুধের নিয়ন্ত্রণের মূল্য প্রকৃত মূল্য থেকে বেশী করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। মৌল ওষুধগুলোর ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট পেটেন্ট ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে নানান রকম কারচুপি করার সুযোগ থাকে। তার উপর থাকে এক্সাইজ ডিউটি বা উৎপাদন কর ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা। এক্সাইজ ডিউটি বা উৎপাদন কর ওষুধের ক্ষেত্রে ধার্য ছিল সবচেয়ে কম। অন্যান্য জিনিষের উপর যখন ছিল এক্সাইজ ডিউটি ১৬ শতাংশ তখন ওষুধের উপর ছিল মাত্র ৮ শতাংশ। মাঝখানে বেড়ে ১৬ শতাংশ হয়ে যায়। ইদানিং আবার ৮ শতাংশ। কিছু কিছু রাজ্যের এস. ই. জেড শিল্পতালুকে এক্সাইজ ডিউটি নেই। আবার ওই ওষুধটিই একই কোম্পানী অন্য কোন ছোট অনুসারী কারখানায় অন্য কোন জায়গায়, যেখানে এস. ই. জেড নেই, বানিয়ে নিজেরা প্যাকেজিং করে পুরো এক্সাইজ ডিউটি দেয়। অনুসারী কোন ছোট কারখানাকে দিয়ে ওষুধটা বানিয়ে নিলে উৎপাদন খরচ কম পড়বে; আর উৎপাদন খরচ কম পড়লে উৎপাদন কর ও কম থাকবে। কিন্তু ওই প্রোডাক্টটাতো একটা জায়গায় তৈরী হয় না। ধরা যাক তিনটে জায়গায় তৈরী হয়। ধরা যাক প্রোডাক্টটার মোট উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ কোন 'Aক্স নামক ছোট কারখানাকে দিয়ে তৈরী করা হয়, যেখানে একটা এক্সাইজ ডিউটি আছে। ৫ শতাংশ আরেকটা 'Bক্স নামক জায়গা থেকে তৈরী হয় যেটা আরেকটা অনুসারী কারখানা।

এখানে উৎপাদনের খরচ একটু বেশী দেখানো হয় -- তাই এক্সাইজ ডিউটি একটু বেশী। বাদবাকী ৮৫ শতাংশ তৈরী হয় ধরা যাক উত্তরাখন্ড বা হিমাচল প্রদেশের কোন একটি কারখানা 'C' নামক জায়গা থেকে, সেটি এস. ই. জেড অঞ্চল এবং এখানে উৎপাদন কর বা এক্সাইজ ডিউটি নেই। কিন্তু তা বলে এই প্রোডাক্টটি উৎপাদনকরহীন ভাবে বিক্রি হয় না। এই ওষুধটির ১০০ শতাংশকেই উৎপাদন করের হিসেবে ধরা হয়ে থাকে এবং 'B' নামক জায়গায় ওষুধের মূল্য যেহেতু বেশী -- সেটাকেই প্রোডাক্টটার ধার্য দাম বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ প্রায় ৮৫ শতাংশ এক্সাইজ ডিউটি না থাকলেও সেটা নেওয়া হয়, আর সরকারের খাতে সেটা জমা পড়ে না -- পুরোটাই কোম্পানী আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ কর তুলেও সরকারের কাছে কর না দেওয়া, উল্টে কোম্পানীর মুনাফার জন্য সাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করার ব্যবস্থা। এই চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে - নেই কোন নতুন ওষুধনীতি। ১৯৯৬ সালের পর আর নতুনভাবে কোন ওষুধনীতির পরিবর্তন হয়নি। ৭৪টি নয় -- নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত ৩৯৫ টারও বেশী ওষুধের। আর তাছাড়া জেনেরিক ওষুধের বাতাবরণ না তৈরী করে জেনেরিক বিক্রি করা মানে ওটা আরেকটা ফাঁকি। একান্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বা মিশ্রিত ওষুধ এগুলো নিয়েও প্রচুর জল্পনা কল্পনা চলে -- কিন্তু ব্যাপারটা বোঝে কজন বা এর জন্য আন্দোলনও তেমন হয় না --- ফলে পুরোটাই সরকার আর ওষুধ কোম্পানীর লুকোচুরি খেলার মধ্যে জনগণকে ঠুলি পরানো।

এর থেকে মুক্তি কিভাবে? জানিনা -- অন্তত আলোচনা চালু থাক। সকলে কি বলছে এটা যাতে জানতে পারি সেই উদ্যোগটুকুই আজকে আশু হয়ে থাকুক।

এখানেও যে গল্পটা আলাদা কিছু নয়, তার নির্দিষ্ট কিছু হদিস পাওয়া গেল ৯ই জানুয়ারী-এ আনন্দবাজারে প্রকাশিত "ওষুধ-সংস্থার খরচে ডাক্তারদের বাইরে যাওয়া, উঠছে প্রশ্ন" শীর্ষক সোমা মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনে।

আমেরিকাতে সম্প্রতি ওষুধ কোম্পানীদের সঙ্গে, ডাক্তারদের সম্পর্ক নিয়ে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলিতে ধরা পড়েছে এই সম্পর্কের নানা কলুষিত দিক। কোথাও ডাক্তারদের সরাসরী টাকা দিচ্ছে কোম্পানীগুলি, কোথাও সরকারী শীর্ষ সংস্থা ফেডারেল ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান (FDA) অনুমোদিত ওষুধে বাজারে বিক্রির নানা কৌশল নেওয়া হচ্ছে। ডাক্তারদের হাত করে। মার্সিয়া অ্যাঞ্জেল তাঁর পুস্তক পর্যালোচনার প্রবন্ধে এরকম হরেক কেলেঙ্কারির কথা তুলে ধরেছেন, যেগুলো বিভিন্ন বইতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছ। প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "ওষুধ কোম্পানীগুলি এখন একটি অত্যন্ত কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করছে - রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধের প্রচার না করে তারা (ডাক্তারদের সাহায্য) রোগের প্রচারে নেমে পড়ছে, তাদের কোম্পানীর ওষুধকে বাজারে খাওয়াবার জন্য। যে কেউ নীচের ওয়েবসাইট থেকে প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন। পেতে পারেন আরও বিস্তৃত তথ্যের উৎসের (বইগুলির) হদিস।

Drug Companies & Doctors : A Story of Corruption - Marcia Angell -New York Review of Books, Vol. 56, No. 1 (Jan 15, 2009) [http://www.nybooks.com/articles/22237] (সৌজন্য ঃ সুদীপ্ত সরস্বতী)

নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে

সমাজ অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা **কালধ্বনি**

যোগাযোগ ২/১ এ আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ টেলি : ৩০৯৪ ৬৪৪০

e-mail : kalodhvani@yahoo.co.in

স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার ?

প্রদীপ সাহা

(পেশায় ডাক্তার এই লেখক বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে ছবি তুলে ধরেছেন, তার ফলিত রূপের সংগে আমরা সবাই হাড়েহাড়ে পরিচিত। কী ভাবে এর অবসান হবে লেখক তার পথনির্দেশক হবার চেষ্টাও করতে যান নি। শুধু তুলে ধরেছেন সামগ্রিক অবক্ষয় আর অনৈতিকতার এক আলেখ্য। দেখাতে চেষ্টা করেছেন এই অব্যবস্থার মূল কারণ গুলো। এই ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর প্রয়াসে এই আলোচনাটি হয়ত কিছু কাজে আসবে, এই আমাদের ধারণা। সঃ মঃ)

কিছুদিন আগের ঘটনা। আমার এক ডাক্তার বন্ধু কাজের সুবাদে কলকাতার বাইরে গেছে। রাতে হঠাৎ তার মায়ের পেটে যন্ত্রণা। বন্ধুর বাড়ির জামাইও ডাক্তার - সে শ্বাশুরিকে ভর্তি করল তার এক সার্জেন বন্ধুর তত্ত্বাবধানে, নার্সিং হোমে। সি টি স্ক্যান ও অন্যান্য পরীক্ষা করে সঠিক কিছু রোগ নির্ণয় হল না। আমার সেই ডাক্তার বন্ধু এসে সোনোগ্রাফি করে বুঝলো পিত্তথলিতে পাথর হয়েছে। চিকিৎসার হাল বুঝে দুদিনের জন্য নার্সিং হোমে ষোল হাজার টাকা গুণে দিয়ে, মাকে ওখানে আর না রেখে বাড়ি নিয়ে এল। এত তো হল ডাক্তারের অবস্থা। বেশ কিছু বছর আগে, ,তখন আমি সরকারি হাসপাতালে কাজ করি। আমাদের পরিচিত এক মিস্তিরি ভর্তি হয়েছে। রক্ত বমি, কালো পায়খানার উপসর্গ নিয়ে। সকালে তার বাড়ির লোকেরা আমাকে খবর দেওয়ায় তাকে দেখতে গেলাম, গিয়ে দেখি সে মরে শক্ত হয়ে গেছে। আর একশ রোগির ওষুধ গোছাতে ব্যস্ত দুজন নার্স তার খবরই জানে না। এই হল আমাদের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা।

একদিকে আমাদের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা, অন্যদিকে স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসায়ের রমরমা। অসুস্থ হলে তাহলে কোথায় যাবেন ? ডাক্তারির ছাত্রাবস্থায় জুনিয়র ডাক্তার হিসাবে কাজ করার সময় ভেবেছিলাম, দাবি করেছিলাম এবং আন্দোলন করে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলাম যে - স্বাস্থ্য আমার অধিকার। আজ বিশ্বায়নের যুগে স্বাস্থ্য অন্য সবকিছুর মতই পণ্য হয়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার, গজিয়ে উঠেছে ওষুধের দোকান। মেডিকেল কলেজ গুলোর বাইরে যেন ওষুধের দোকানের হাট বসে গেছে। এ যেন চিকিৎসা নয়, নানান রঙের মোড়কে পণ্য বিক্রির মহোৎসব। শপিং মল - এর ভিড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে আমাদের কৈশোর-প্রথম যৌবনের স্বপ্ন। স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার না হয়ে আজ হয়ে গেছে ব্যবসার হাতিয়ার - দারুণ লাভদায়ক এক পণ্য। তাই একদিকে গড়ে উঠতে দেখা যায় নতুন নতুন ডায়গনস্টিক সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অবনতি হতে থাকে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার।

।। দুই ।।

কেন এমন বেহাল দশা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার? বিভিন্ন পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায় এর প্রধান কারণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাপারেই সরকারের সবচেয়ে বেশি অনীহা। কেন ? কারণ এগুলো সরকারকে কোন আয় যোগায় না। সরকার তার এই গাফিলতি সর্বদা কুখ্যাত নাৎসি গোয়েবলস - এর কায়দায় অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, কখনও ডাক্তার, কখনও নার্স, কখনও বা স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের দোষী সব্যাস্ত করে।

এ সবের ওপর এখন নতুন এক প্রকল্প চালু হয়েছে - প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ, তাতে নিজের দায় এড়ান যাচ্ছে, আবার সরকারি জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে অবাধ ব্যবসার সুযোগ। এর ফলে পরিষেবার উন্নতি তো হচ্ছেই না, বরং মার খাচ্ছে মেডিকেল শিক্ষা। তার উপর কোনো পরিকাঠামো ছাড়াই সরকার গড়ে তুলছে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ। নিয়মাফিক পরিকাঠামোহীন চলতি কলেজগুলোর স্বীকৃতি রাখতেই কত ছলছুতোর আশ্রয় নিতে হয়, যখন মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যরা পরিদর্শনে আসে। পরিদর্শনের সময় সরকারি বাসস্থানকে হোস্টেল বানান, শিক্ষকদের সাময়িক ভাবে স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসা - এ রকম তাপ্পি দিয়েই চলছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আর চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা।

।। তিন ।।

বেশি পরিসংখ্যান দেবার দরকার নেই, মাত্র দু-একটি তথ্যই বুঝিয়ে দেবে কী ভয়ানক অবস্থায় আছে ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা। ন্যশনাল ফামিলি সার্ভে - এর ২০০৫-০৬ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতের মহিলাদের মৃত্যুর হার কম্বোডিয়া, বলিভিয়া বা বোৎসোয়নার থেকেও বেশি - প্রতি ১ লক্ষ ভারতীয় মহিলার মধ্যে ৪৫৩ জনের মৃত্যু হয়। সারা বিশ্বের ২০ শতাংশ মহিলার মৃত্যু হয় ভারতে, প্রতি ৫ মিনিটে একজন মহিলার মৃত্যু হয় এ দেশে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মূল্যায়নের আর একটা মাপকাঠি হল শিশু মৃত্যুর হার। সারা বিশ্বের ৫ বছরের নীচে শিশুর ২০ শতাংশ মৃত্যু ভারতে হয়। কলকাতার বি সি রায় শিশু হাসপাতালে ঘন ঘন শিশু মৃত্যুর ঘটনা তো প্রায়ই খবরের শিরোনামে চলে আসে।

এ হেন পরিস্থিতিতেও সরকার কী রকম পদক্ষেপ নিচ্ছে তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট। ভারত সরকার ডি জি পি - র মাত্র এক শতাংশ খরচা করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পেছনে। এ ভাবে কী সুস্থ স্বাস্থ্যবান প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব?

তাহলে আমরা কোথায় চলেছি? বিশ্বায়ন আর পুঁজিবাদি ব্যবস্থার রাজা আমেরিকাই আমাদের লক্ষ্য। বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প গুলি আমাদের সে দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই স্বাস্থ্য অধিকার থেকে পণ্যে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। যার যত ক্রয় ক্ষমতা এ ব্যবস্থায় সে তত সুযোগ পাবে। বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যার বড় একটা অংশ (২০.৭ শতাংশ) - যারা দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করে আর যারা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, তারা হয় অপর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবা পায় অথবা কোনো চিকিৎসাই পায় না। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বেসরকারিকরণের ফলে আরও কম লোক চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারবে।

আমাদের আদর্শ দেশ আমেরিকায় অবস্থাটা কি দেখা যাক। সেখানে স্বাস্থ্য বীমার পর চালু হয়েছে Consumer Driven Health Care (CDHC), যার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ডের মত আপনি আপনার যতটা বরাদ্দ ততটাই স্বাস্থ্য সেবা আপনার পছন্দ মত গ্রহণ করতে পারেন। এই পরিষেবার মূল্য পরে পরিশোধ করে দিতে হবে। সুতরাং Haves and Have nots দের মধ্যে তফাৎ বেড়েই চলেছে। এর ফলে সে দেশে বীমাকারিদের মাত্র ২ শতাংশ এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছেন। তাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমরা কি চাই। চাকচিক্যের মধ্যে হারিয়ে যেতে, নাকি সবার জন্য সমান সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, যা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান সমাজ গড়ে তুলবে।

।। চার ।।

আমাদের চিকিৎসকদের কী অবস্থান? এ সমাজ ব্যবস্থায় শুধু ব্যক্তিগত লাভ দেখতে গিয়ে মানুষ নিয়ে ব্যবসায় মেতেছি। ভুলে গেছি সব মানবিকতা। এ চক্র ভাঙ্গা দরকার। তা না হলে আমার এক রোগির বলা গল্পটাই সার্থক হয়ে যাবে। গল্পটা শুনিয়ে লেখাটা শেষ করি - এক দিন ওই ভদ্রলোকের ভৃত্য এসে বলল, বাবু এক ভদ্রলোক এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন। তখন তিনি বেরিয়ে এসে আগন্তুককে দেখে বল্লেন - কি যে বলিস, ভদ্রলোক কোথায়, এ তো ডাক্তারবাবু!

বইমেলায় বিওবি

ময়দানে নয়, ২০০৯-এর ৩৪ তম কলকাতা পুস্তক মেলার আসর এবার মিলন মেলায়।
দৌড়ো দৌড়ি-সাজিয়ে বসা আর প্রকৃতির-অসহযোগ সহযোগে এই মেলায় থাকছে বিওবি,
যথারীতি ছোট্ট টেবিল স্পেসে। উদ্দেশ্য কাঙ্ক্ষিত-জন অথবা হারিয়ে যাওয়া-হারাতে বসা
কিংবা হঠাৎ হয়ে-যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে নতুন করে চেনাচিনিটুকু।
এইই তো বিওবি-র পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা...।

তথ্য জানার অধিকার আইন কোথায় দাঁড়িয়ে এখন

রবীন চক্রবর্ত্তী

তথ্য জানার অধিকার আইন চালু হয়েছে বছর তিনেক হল। এই আইনের হালহকিকৎ জানতে একটা সমীক্ষা হয়েছিল। ন্যাশানাল ক্যাম্পেন ফর পিপলস রাইট টু ইনফরমেশন এবং রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যানালিসিস গ্রুপ নামের দুটি বেসরকারি সংস্থা এই সমীক্ষা চালিয়েছিল। এদের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে এই আইনের ব্যবহার বাড়ছে। তবে খুবই ধীরে। মানুষ ক্রমে ক্রমে এই আইনের সাহায্য নিতে এগিয়ে আসছে। এই আইনের সাহায্য নিয়ে মিউনিসিপালিটি এবং সরকারকে দিয়ে কিছু ফেলে রাখা কাজ করিয়ে নেওয়া গেছে। অনেক জালিয়াতির জোচ্চুরি খবর ফাঁস করা গেছে। কিছু ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষও এই আইনের সাহায্য নিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদনের জবাব বা তথ্য পাওয়া যায়নি। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে যারা এই আইন সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করছে এবং কিভাবে আবেদন করতে হবে, কিভাবে অভিযোগ জানাতে হবে- এই সমস্ত ব্যাপারে সাহায্য করছে। কিছু কিছু সংগঠন যারা অন্য কাজে নিযুক্ত তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কাজের সাথে এই আইনের প্রচারের কাজটাও করছে। কিছু কিছু খবরের কাগজে নিয়মিত এই বিষয়ে ভাল-মন্দ নানান ঘটনার খবর ছাপা হচ্ছে। সে সমস্ত ঘটনার কিছু নমুনা তুলে ধরা হল।

এক

দিল্লি হাইকোর্টের কাছে আদালতের কয়েকদিনের 'কজ-লিস্ট'-এর কপি চেয়ে একটি আবেদন জমা পড়েছিল। দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল যে ওই লিস্ট দেওয়া যাবে না। কারণ কি কারণে এটা চাওয়া হচ্ছে সেটা আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়নি। এডভোকেট দীনেশ খান্না হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দিল্লীর চিফ ইনফরমেশন কমিশনারের (সি আই সি-র) কাছে আবেদন করেন। সিআইসি সবার কথা শুনে রায় দেন যে কোর্টের তৈরি করা 'লিস্ট'একবার 'কোর্ট মাস্টার'-এর কাছে পৌছলে পর সেটাকে 'পাবলিক ডকুমেন্ট' বলে গণ্য করতে হবে। যেকেউ সেটা তখন দেখতে চাইতে পারে। দেখতে চাইলে কোর্ট সেটা দেখাতে বাধ্য। তাদের তোলা প্রশ্নটিকে সিআইসি এই বলে নাকচ করেছেন যে আর টি আই আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে যে তথ্য জানতে চাইবার সময় কেন চাইছে সেই কারণ জানাবার কোনো দরকার নেই। স্বভাবতই হাইকোর্ট এই রায়ে খুশি হয়নি।

দুই

জনৈক লোখি রাম দিল্লীতে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ায় (সাই-এ) এসসি-এসটি কোটায় অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর পদে নিযুক্তির জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তার চাকুরি হয় না। তখন তিনি সাই-য়ের চিফ ইনফরমেশন অফিসারের কাছে কি কারণে তার নিয়োগ হল না এই তথ্য জানতে চেয়ে চিঠি লেখেন। এর জবাব না পেয়ে তিনি দিল্লীর চিফ ইনফরমেশন কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে সিআইসি রায় দেন যে এই তথ্য সরবরাহ না করে সাই-য়ের সিআইও ঠিক করেন নি। এটা শাস্তি-যোগ্য অপরাধ। তিনি আর টি আই আইনের ২০(১) ধারা অনুযায়ী ১০,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করেছেন। সাই কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন যে চার কিস্তিতে যেন এই টাকা ওই অফিসারের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হয়।

তিন

বিজেপি এবার দিল্লীতে ভোটের আগে আর টি আই আইনের সাহায্য নিয়ে সরকারকে জব্দ করার লাইন নিয়েছিল। তারা আর টি আই আইনের সহায্য নিয়ে

কিছু তথ্য বার করে সেটা প্রচারের হাতিয়ার করে। যেমন গত দু'বছরে দিল্লি সরকার বিপুল অঙ্কের টাকা (৪৫ কোটি টাকা) বিজ্ঞাপন খাতে খরচ করেছিল। এত টাকা ব্যয়ের অনুমোদন ছিল না। এই খবর তারা বের করে তথ্য জানার অধিকার আইনের বলে। এই বেআইনি কাজের বিষয়টি তারা নির্বাচনে প্রচারের কাজে লাগিয়েছিল। রাজীব গান্ধী আবাস যোজনা ব্যর্থতার বিষয়েও একটি তথ্য জোগাড় করেছিল। ওই যোজনায় দরিদ্রদের জন্য ৬০,০০০ গৃহ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৯৪৩৬টি গৃহ নির্মাণের পথে। এটিও তাদের প্রচারের একটা ইস্যু ছিল।

চার

বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরনোর পর এক পরীক্ষার্থী পেপার-ওয়ারি তার নম্বরের ব্রেক-আপ চেয়ে সার্ভিস কমিশনের কাছে আবেদন করে। কমিশন সেই আবেদন নাকচ করে দেয়। বলে ওইভাবে নম্বর জানান যাবে না। তখন ওই পরীক্ষার্থী স্টেট ইনফরমেশন কমিশনারের (এস আই সি-র) দ্বারস্থ হয়। ইনফরমেশন কমিশনার পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে জানায় যে ওই পরীক্ষার্থী নম্বরের ব্রেক-আপ জানার অধিকারী। তাকে নম্বর জানান হোক। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এস আই সি-র এই নির্দেশ মেনে নেয় নি। বিষয়টি নিয়ে পাটনা হাইকোর্টে যায়। হাইকোর্ট দুপক্ষের বক্তব্য শুনে এস আই সি-র নির্দেশই বহাল রাখে। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে আর টি আই আইনটি করা হয়েছে প্রশাসনের কাজে স্বচ্ছতা আনতে, যাতে প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা যায়। নম্বর জানানর এই নিয়মটি বহাল হলে সেই উদ্দেশ্যই সফল করবে।

পাঁচ

দিল্লির হোম ডিপার্টমেন্টের কিছু অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কারণে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যায়। তখন শুতি সিং চৌহান বলে এক ভদ্রলোক তথ্য জানার অধিকার আইন অনুসারে কাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানতে চান। তদন্তের ব্যাপারটা গোপনীয় বলে হোম ডিপার্টমেন্ট এই তথ্য জানাতে অস্বীকার করে। মি: চৌহান তখন সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের দ্বারস্থ হন। সি আই সি সব খতিয়ে দেখে রায় দেন যে 'গোপনীয় তথ্য' এই অছিলায় কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি অফিসারকে আড়াল করা যাবে না।

ছয়

উড়িষ্যার পুরী জেলার গোপ ব্লকের বানাখন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি ঘটনা। গ্রামের মহিলারা জানতে পারে যে পল্লীসভা বলে একটা ব্যাপার আছে যাতে গ্রামের সবাই অংশ নিতে পারে এবং বছরে অন্তত একবার সেই পল্লীসভার মিটিং হওয়ার কথা। কিন্তু কখনই সেই মিটিং হতে তারা দেখেনি। মহিলারা তখন ব্লক অফিসে গিয়ে পল্লীসভা ডাকার ব্যবস্থা করার আবেদন জানায়। বিডিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে পল্লীসভার আয়োজন করতে বলে। এই বছরেরই জুলাই মাসের ৭ তারিখ সেই সভা হয়। অবাক হওয়ার ব্যাপার যে সেই সভায় কেবল মহিলারাই যোগ দেয় এবং তারাই আলোচনায় অংশ নেয়।

এই সভা থেকে মহিলারা জানতে পারে যে খুব শিগগির তাদের গ্রামে একটি রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। তখন তারা একটি কমিটি বানিয়ে ফেলে যারা রাস্তা বানানর কাজ তদারকি করবে। এর পর পঞ্চায়েতের কাছ থেকে রাস্তা তৈরির কাজের এস্টিমেট দেখতে চায়। কিন্তু প্রধান সেটা দেখায় না। বলে এস্টিমেট নেই। তড়িঘড়ি কাজ শুরু করার জন্য কাজের এস্টিমেট না নিয়েই কাজ শুরু করা হচ্ছে বলে জানায়। মহিলারা এস্টিমেট দেখানর দাবীতে অনড় থাকে। পঞ্চায়েতের লোকজন কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এর পর কিছু দালাল প্রকৃতির লোক ও ঠিকেদারের লোকেরা ওই মহিলাদের নানাভাবে শাসাতে থাকে। এমন কি বলে যে ওদের নামে পুলিশের কাছে মিথ্যে ডায়েরি করিয়ে তাদের জব্দ করবে।

এই ধরনের হুমকির মুখে ওই মহিলারা তখন আর টি আই আইনের সাহায্য নেয়। এস্টিমেট দেখতে চেয়ে বিডিও-র কাছে পাঁচটি আবেদনপত্র জমা দেয়। আবেদনপত্রে জানায় যে এস্টিমেট না দেখানো অবধি যেন কাজ বন্ধ রাখা হয়। বিডিও ঝামেলায় পড়ে। প'ায়েত প্রধানকে ব্যবস্থা নিতে বলে। অবশেষে গত ৮ই সেপ্টেম্বর প'ায়েত প্রধান সেই এস্টিমেটের কপি মহিলাদের হাতে তুলে দেয়।

সাত

আর টি আই আইনের ব্যাপারে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে ভাবলে ভুল হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আবেদনপত্র দিনের পর দিন পড়ে থাকছে। ইনফরমেশন কমিশনের কাছে অভিযোগ জমা দিয়েও কাজ হচ্ছে না। হিয়ারিং-এর ডেট পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক সময় বছর ঘুরে গেলেও অভিযোগের সুরাহা হচ্ছে না। আইনে বলা আছে যে- তথ্য সরবরাহে গাফিলতি করবে যে অফিসারেরা, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে কমিশন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। আর টি আই আইন নিয়ে প্রচারের কাজ করছে যে লোকজন তারা মনে করছে এইভাবে চললে এই আইনের কোনো মানেই থাকবে না। তাই আর টি আই অ্যাক্টিভিস্টরা 'সেভ আর টি আই অ্যাক্ট' বলে একটা ক্যাম্পেন শুরু করেছে। এই ব্যাপারে আলোচনা করতে ২১টি রাজ্যের প্রায় দেড়'শ কর্মী গত আগস্ট মাসে দিল্লীতে একটি আলোচনা সভায় মিলিত হয়েছিল। এর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিল অরভিন্দ কেজরিওয়াল। যিনি আর টি আই আইনের প্রচারক হিসেবে ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী সুপরিচিত। এই সভায় ঠিক হয় যে আর টি আই আইন নিয়ে মানুষের অভিযোগ সংগ্রহ করা হবে এবং একটা পাবলিক অডিটের ব্যবস্থা করা হবে।

আট

সম্প্রতি সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের একটি রায়ে খোদ ভারত সরকার বেজায় ফাঁপরে পড়ে গেছে। সম্প্রতি এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতামত চালাচালি চলছে। এই সময় দাবী ওঠে যে এই আলোচনার বিষয় জনসাধারণকে জানতে দিতে হবে। কারণ অনেকে মনে করেছে এই আইনের বিষয়ে সাধারণ মানুষ নিজেদের মতামত তৈরি করতে বা এই বিষয়ে যারা চাইবে তারা যাতে জনমত গঠন করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এই মতামতগুলো জানা দরকার।

এই মর্মে আর টি আই আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। বলা হয় যে এগুলি 'ক্যাবিনেট পেপার', 'গোপনীয় বিষয়'। দেখানো যাবে না। এর বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান হয়। কমিশন দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে রায় দিয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে যে এই আইনের সংশোধন বিষয়ে আলোচনাপর্বের সমস্ত কাগজপত্রই 'পাবলিক ডকুমেন্ট'। তাই সেগুলি দেখান যেতে পারে। তবে দেখানর জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশও দেওয়া হয়নি। রায়ের বয়ানে একটু ধোঁয়াশা রেখে দেওয়া হয়েছে। তবে স্পষ্ট করে যেটা বলা আছে তা হল ড্রাফট-টা রেডি হয়ে গেলে আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ কেউ চাইলে দেখতে দিতে হবে। এমনিতে নিয়ম হল আইনের ড্রাফট হয়ে গেলে সেটা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা। উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ যাতে এর ওপর মতামত জানাতে পারে। এর সাথে যোগ হল যে এবার থেকে আলোচ্য আইনের ওপর বিভিন্ন মন্ত্রকের মতামতগুলিও চাইলে জনসাধারণ জেনে নিতে পারে। সিআইসি-র এই নির্দেশের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কারণ বুঝতে পারছে আগামী দিনে কোনটা ক্যাবিনেট পেপার কোনটা নয় এই নিয়ে বিতর্ক দেখা দেবে। সব ব্যাপারেই মন্ত্রকে মন্ত্রকে কতরকম কূট-কাচালি চলে। সেগুলো সব প্রকাশ্যে এসে যাবে। মন্ত্রীসভায় আলোচনার বিষয় বলে কথা। কি পবিত্র সেই সেসব বাণী! এই মিথটাই ভেঙ্গে যেতে পারে, সেটাই আতঙ্কের বিষয়।

নয়

তথ্য জানার অধিকার আইনের কার্যকারিতা নিয়ে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল এই বছরের প্রথম দিকে। সোসাইটি ফর পারটিসিপেটরি রিসার্চ ইন এশিয়া বা সংক্ষেপে 'প্রিয়া' বলে যাকে চেনে অনেকে তারা এই সমীক্ষাটা করেছিল। বিভিন্ন রাজ্যের সাড়ে চার'শ মানুষকে ইন্টারভিউ করে তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বেশির ভাগ রাজ্যের স্টেট ইনফরমেশন কমিশনারের উদ্যোগ এবং আগ্রহের অভাব-ই এই আইন কার্যকর হওয়ার পথে একটা বড় বাধা। এদের কাছে হাজার হাজার অভিযোগ এসে দিনের পর দিন জমা হয়ে পড়ে থাকছে। অনেক ক্ষেত্রে বৎসরাধিক কাল কেটে যাচ্ছে। শুনানি হচ্ছে না। কোনো রায় বেরচ্ছে না। কারো বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে না। ফলে যারা তথ্য সংগ্রহ করে দেবে সেই ইনফরমেশন অফিসারেরা দিব্যি গা বাঁচিয়ে চলতে পারছে।

এছাড়া যে অসুবিধেগুলি এই আইন কার্যকর হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ তা হল প্রথমত কোথায় বা কার কাছে গিয়ে তথ্য জানার আবেদন জমা দিতে হবে তার হদিস পাওয়াই শক্ত। অধিকাংশ অফিসে ইনফরমেশন অফিসার বা পি আই ও-ই নেই বা থাকলেও তার হদিস পাওয়া শক্ত। পিআইও-র কাছ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা কম। এমন কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে যেখানে আবেদনকারীকে পিআইও কাছ থেকে রীতিমত ধমকানি শুনতে হয়েছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর তথ্যটি সংগৃহীত হল কিনা জানতে বার বার ছুটতে হয়েছে অফিসারের কাছে এমন অভিযোগ করেছে অনেকে।

বড় বড় শহরে তাও আবেদন পত্র যা হোক করে জমা দেওয়া যায়। কিন্তু জেলা এবং ব্লক স্তরে কাজটা খুবই শক্ত। বেশির ভাগ রাজ্যেই এই একই চিত্র। কোথায় জমা দেওয়া যাবে এই মর্মে যে ডাইরেক্টরি থাকার কথা সেটা বেশিরভাগ জায়গাতেই নেই। দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম বার আবেদন করে ব্যর্থ হয়েই চুপ মেরে গেছেন অনেকে। এরপর যে নিয়ম মাফিক দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আপীল করবে সে ধৈর্য অনেকেরই থাকে নি। কারণ তাদের মনে হয়েছে ওসব করে লাভ নেই। - করতে গেলে শুধু শুধু পন্ডশ্রমই হবে।

এসব বলার পরও প্রতিবেদনে জানান হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে স্টেট ইনফরমেশন কমিশন চাইলেও লোকবলের আভাব, অর্থের অভাব এবং আনুষঙ্গিক নানান অসুবিধের কারণে কাজ করতে পারছে না। এটাও সত্য।

দশ

ভারত সরকার তথ্য জানার অধিকার আইন প্রয়োগের ব্যাপারে একটা নতুন ব্যবস্থা করেছে। যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাদের জন্য। বলা হয়েছে যে এবার থেকে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানর কাজটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা যাবে। কিভাবে করতে হবে সেটা তাদের ওয়েবসাইট খুলে দেখে নিতে হবে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা হল :<www.rti.india.gov.in>

এগার

কলকাতাতেই আর টি আই আইন বিষয়ে প্রচার এবং সহায়তা দেওয়ার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল আর টি আই ম' নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে। তথ্য জানার অধিকার আইন নিয়ে কিছু জানার জন্য বা এই নিয়ে কাজ করতে চাইলে এদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

যোগাযোগ:

মলয় ভট্টাচার্য, ৬৬ ফিয়ার্স লেন, কলকাতা ৭০০০৭৩ ।

মোবাইল: ০৯৪৩৩৬২০১৯২ ।

বিজ্ঞানে না বিশ্বাসে! প্রশ্ন তুলেছেন পদার্থবিদ পল ডেভিস

নিখিলেশ পাল

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও গবেষক পল ডেভিস' এর ' গড এন্ড দ্য নিউ ফিজিক্স' ও 'দ্য মাইন্ড অফ গড' বই দুখানি বিজ্ঞানীমহলে সোরগোল তো তুলেই ছিল।

কিন্তু সম্প্রতি 'টেকিং সায়েন্স অন ফেথ' শিরোনামে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি লিখে বোলতার চাকে দ্বিতীযবার ঢিলটি মারলেন । হৈ হৈ করে উঠেছে বিশ্বের পদার্থবিদ–কুল। জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বই লিখেও তিনি সমধিক পরিচিত, তাঁর মতে ধর্ম বিশ্বাসের মতো পদার্থ বিজ্ঞানের সৌধগুলো দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসে ভর করা স্তম্ভে (Pillars) বা গাণিতিক সূত্রে। মহাকর্ষ থেকে গতিসূত্র, তড়িৎ চুম্বকীয় সূত্র , নিয়ন্ত্রিত পরমাণুর খোলসের (ইলেকট্রন মেঘ) বর্হিগঠন থেকে কেন্দ্রের (নিউক্লিয়াস) অন্তর্গঠনের বিচিত্র নাটকীয় বল (Force) এর অভিব্যক্তির নিয়মাবলীর উৎস কোথায়? অর্থাৎ ওই নিয়মগুলোর পিছনের কারণ কি তা আজও অজানা। পল ডেভিসের বক্তব্য নিয়মগুলো 'এখন যে রকম' — না হয়ে 'অন্যরকম' নয় কেন? এ বিপুল মহাবিশ্বে, স্থানভেদে, নিয়মগুলো আলাদা আলাদা–ই বা কেন?

পৃথিবীর সারফেস থেকে কেন্দ্রে পদার্থের প্রকৃতির সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। আবার সূর্যের কেন্দ্রে পরমাণু ও বিভাজিত কেন্দ্রীন কণাদের গতিবিধির প্রকৃতি ও ধর্ম (ওখানকার চরম তাপীয় অবস্থার জন্য) আজও ব্যাখ্যার অতীত। কোন আঙ্কিক সমীকরণে তা আজও অধরা। আলোকমণ্ডল থেকে বহুদূরে (বাইরের দিকে) করণায় (পূর্ণ সূর্যগ্রহণে যা দৃষ্ট হয়) তাপমাত্রা হট করে কয়েক লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাওয়াটা তো বিস্ময়কর! কৃষ্ণগহ্বর থেকে উৎসারিত আলো (একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক পরীক্ষা বা Thought Experiment/ জার্মান শব্দে বলা হয় Gedankel) ফোয়ারার জলবিন্দুর মতো বেঁকে আবার কৃষ্ণগহ্বরেই ফিরে আসা তো এক আজব কাহিনি।

বিজ্ঞানে ধর্মবিশ্বাসের অনুপ্রবেশ গণিতশাস্ত্রের সবচেয়ে শক্তিমান সংখ্যা শূন্যকে (O) দিয়ে। অস্তিত্বহীন অ–বাস্তব এই চিহ্নটি ছড়িয়ে আছে বিজ্ঞানের পল্লবিত সমস্ত শাখা প্রশাখায় ও দৈনন্দিন জীবনে, যা অন্তত তিনদিক দিয়ে যেন ধর্মের আগলে বাঁধা। ক) শূন্য দিয়ে কোন সংখ্যাকেই ভাগ করা নিষিদ্ধ। (খ) শূন্য দিয়ে কোন সংখ্যা শুরু হলে তা ধর্তব্য নয় নিদেনপক্ষে তার পূর্বে একটি দশমিক চাই। (গ) 'শূন্যকে' অস্তিত্বহীন বা নাথিং এর সাথে গুলিয়ে ফেলা কদাচ নয়। তাই 'O' কে গণিতে 'দীক্ষিত' করার জন্য শর্ত আরোপ হল যেমন ৬+০ = ৬ হয় তবে ৬+ নাথিং = আনডিফাইন্ড বা অর্থহীন । উদাঃ এক ব্যক্তির ব্যাঙ্কে একাউন্ট আছে কিন্তু টাকা নেই তার ব্যালান্স হল 'শূন্য' কিন্তু যার কোন অ্যাকাউন্টিই নেই – তার ব্যলান্স হল আনডিফাইন্ড। যে একটি কোর্স কমপ্লিট করে কোন গ্রেড পেলনা তা হল 'শূন্য' আর যে কোন কোর্স–এ ভর্তিই হয়নি তার গ্রেড হল 'আনডিফাইন্ড'। ক্যালকুলাসের জনক লাইবনিৎস অবশ্য মনে করতেন 'God had created the universe '1' (symbolised by one) Out of nothing 'O' (symbolised by zero) যেমন — কেউ বলেছেন 'নৈঃশব্দ শব্দহীনতা নয়, শব্দশুদ্ধি মাত্র' । নৈঃশব্দেরও রয়েছে অর্থবহ ব্যঞ্জনা। আবার শঙ্খ ঘোষের কবিতায় 'শূন্যতাই জানো শুধু? শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে, সে কথা জাননা?' শূন্য চিহ্নটি ভারতীয় সৃষ্টি, কিন্তু প্রথম প্রচলন আরব্যব্যবসায়ীদের হাতে আর ইউরোপিয়ানরা ভয় পেত সহজেই কারচুপি করা যাবে ভেবে। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ যিনি অঙ্কশাস্ত্রকে 'Queen of Sciences' আখ্যা দিয়েছিলেন সেই ফ্রেডরিখ গাউস –এর motto ছিল Thou, nature art my goddess, to thy laws - my services are bound.....

১৭৭২ সালে জোহান বোর্ড সাধারণ পাটিগণিতীয় পদ্ধতিতে কতগুলো সংখ্যার অনুক্রম (sequence) সাজিয়ে সূর্য থেকে গ্রহগুলোর (নেপচুন ছাড়া) দূরত্বের অনুপাতের ইঙ্গিত দিলেন। তখনও অনাবিষ্কৃত ইউরেনাস, প্লুটো, ও গ্রহাণুদের ঐ সূত্রধরেই খুঁজে পাওয়া গেল যা বোড টিটিয়াস্ ল নামে পরিচিত। ১৮৬৯ সালে মেন্‌ডেলিয়েভ ৮ সংখ্যার (Octave) 'যাদু'কে কাজে লাগিয়ে তৈরী করলেন পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায়ক্রম সারণী। পরমাণুদের রাসায়নিক ধর্মের সঙ্গতির ছন্দই শুধু নয় ঐ

সূত্র ধরে জার্মেনিয়ামের মত অপরিহার্য্য নতুন পরমাণুদের আবিষ্কারও হলো। মেন্‌ডিলিয়েভকে বলা হত পরমাণুজগতের কোপার্নিকাস। উভয়ক্ষেত্রেই এই অনুসন্ধানের পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কাজ করেনি, সংখ্যাগুলির প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস–ই ছিল এই সব আবিষ্কারের উৎস।

মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে রহস্য থেকেই গেছে, 'একজন মানুষকে তো এই পৃথিবী কত জোরে আকর্ষণ করে তাহলে পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে একখানা পা মাটি থেকে তুলি কি করে? আমাদের পায়ে কি এত শক্তি আছে?'

ইনফিনিটির 'চূড়ায়,' উপত্যকায়, আর চূড়ার আকাশে, অকল্পনীয় যে সংখ্যাদের বাসভূমি , জর্জ ক্যান্টর তার মানচিত্র (সমীকরণ) তৈরী করলেন; যুক্তি আর ভাবলোকের মেলবন্ধনে এক নতুন 'স্বর্গ রচনা করলেন'— সংখ্যার এই নব্য সেট থিয়রি বা তত্ত্বটিও বিশ্বাসনির্ভর। সমকালীন গণিত জগতের ন্যায়রত্নরা মানতে চাননি এই বলে 'অসীম মানে তো ঈশ্বর। সসীম মানুষের কোন ক্ষমতা বা অধিকার নেই ঈশ্বরকে নিয়ে খেলা করার'। রামানুজম ভাবতেন শূন্য থেকে কিছুটা ও ইনফিনিটি থেকে কিছুটা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মাঝের সংখ্যাগুলি।

পল ডেভিস বিরোধীদের বক্তব্য -''ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের আবির্ভাব ওই (বর্তমান) নিয়মগুলোর উপর ভীষণ নির্ভরশীল। এরা অন্যরকম হলে প্রাণের চিহ্ন মিলত না।'' ও পরে ''অন্যরকম হবে কেন, অন্যরকম হলে আমরা আজ থাকতাম না।'' এই যুক্তিকে মানা যায় না কারণ নোবেলজয়ী জৈব–রসায়নবিদ সালভাদোর লুডিয়া'র কথায় (''লাইফ দি আনফিনিশিড এক্সপেরিমেন্ট'') ' কোন প্রাণ সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিবর্তন বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় নি।' জীবন এসেছে ধূমকেতুর মত হঠাৎ চলে আসা আকস্মিকতায়। রবীন্দ্র – কাব্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও 'বিশ্বপরিচয়' –এর আলোচনায় পদার্থবিদ চঞ্চল কুমার মজুমদার ' যো বিশ্বং ভুবনং আবিবেশ ' (যিনি বিশ্বে প্রবেশ করিলেন) প্রবন্ধে — 'বিশ্বজগত এক প্রচন্ড বিস্ফোরণে সৃষ্টি হয়ে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। তারপর বিবর্তনের পথে আকস্মিকভাবে প্রাণের সৃষ্টি । দেশকালের পটভূমিকায় জীবন প্রকৃতির এক ক্ষণিক বিলাস।' তবে কেন তার এত বর্ণ, এর বৈচিত্র, এত আড়ম্বর? বিশ্বপরিচয় লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বার বার এ প্রশ্নটি এসেছে। 'বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি। এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী?' (জন্মদিন ১১ সংখ্যক কবিতা) 'দিবসের শেষ সূর্য/ শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল / পশ্চিম সাগরতীরে / নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় / কে তুমি? / পেল না উত্তর।' (প্রথম দিনের সূর্য।)

জীব বিদ্যার অ্যানালজিতে জীবন এর সংজ্ঞা নির্ধারণে 'জিনোম' নামক প্রাণের আণবিক এককটি যেমন শেষ কথা নয় অর্থাৎ শুধু জিনোমে তো আর প্রাণের অভিব্যক্তি (চাঞ্চল্য) নেই, বীজ মাত্র'। পদার্থ বিদ্যার গাণিতিক সূত্রগুলো কি তবে সেরকম?

কোপার্নিকাস, কেপলার তাদের গণিতিক সূত্র আর প্রকৃতির কর্মকান্ডের মাঝের যোগসূত্র যে ঈশ্বরেরই হাত – তাই মানতেন । গ্যালিলিওর বক্তব্য '' প্রকৃতি তার 'দর্শন' লিখে রেখেছে বৃত্ত, ত্রিভুজ ও অন্যান্য জ্যামিতিক আকৃতির অ্যালফাবেট দিয়ে তৈরি তার নিজস্ব ভাষায় ।'' ল্যাগরেনজ, হ্যামিলটন, ম্যাক্স প্লাঙ্করা কোন আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় অনুভূতিকে আমল দেননি তাদের বৈজ্ঞানিক প্রয়াসে। কারো মতে প্লেটো যদি বাইবেল লিখতেন, সূচনা–ই করতেন এভাবে 'ঈশ্বর প্রথমেই গণিত সৃষ্টি করলেন, তার পরে সেই নীতি দিয়ে স্বর্গ ও পৃথিবী .....।' তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ডিরাক ছাত্রদের বলতেন সমীকরণের ' সৌন্দর্য্য' –এর দিকে নজর রাখতে।

গণিতবিদ্ মিহির চক্রবর্তী (যিনি মনে করেন, 'গণিত অনেক কাছাকাছি শিল্পের অথবা কবিতার। ... মোট গণিতের সামান্য অংশই ব্যবহারযোগ্য, সত্য আবিষ্কারের দাবিও তার কাছে করা আর সঙ্গত নয়'। 'গণিতের ধারাপাত ও গল্পসল্প' (নান্দীমুখ সংসদ) বইটির সূচনাই করেছেন রবীন্দ্রনাথের ছোট রচনা 'পাগল' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ..... 'খ্যাপা নিমাইকে আমরা খ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি, আমাদের খ্যাপা দেবতা মহেশ্বর । .....সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে।' 'খ্যাপা সুখ–প্রত্যাশী নয় অন্যের তৈরী নিয়মে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে রাজি হয় না সে। পল ডেভিস হয়তো এমন – ই একজন 'খ্যাপা'।

কৃতজ্ঞতা ঃ শ্রী পথিক গুহ ও অধ্যাপক মিহির চক্রবর্তী।

অন্যান্য তথ্য সূত্রঃ The Physical World of Mathematics - Dover Pub by Morris Kline
চঞ্চল কুমার মজুমদারের প্রবন্ধ ঃ রাতের তারা দিনের রবি, – সম্পাদনা উজ্জ্বল কুমার মজুমদার। ''আনন্দ''

With best compliments from

Amit Kumar Mitra

Mobile: 9830355416

AMIT ENTERPRISE

(A HOUSE OF PIONEER IN CHEMICAL PRODUCTS)

Deals with: Laboratory Chemicals, Instruments, Filter Paper,
Glassware, Plasticware etc. for Scientific & Educational Institutions and Industries.

23/A, NARKEL BAGAN LANE, KOLKATA- 700 009

এক

ন্যানো নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর

'ন্যানো' মোটর গাড়ির কারখানা সিঙ্গুর থেকে গুজরাটে চলে গেল। চলে যাবার সংবাদ দিতে শ্রী রতন টাটা সুদূর জার্মানী থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন। তারপর একটি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করে চলে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে এই রাজ্যের মানুষের মঙ্গলের কথা ভেবে তিনি কারখানার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের জন্য তাকে চলে যেতে হচ্ছে। এখানে কিছু মানুষ তাকে চাইছে না। একজন 'আন-ওয়ানটেড করপোরেট সিটিজেন' হিসেবে তিনি এখানে থাকতে চান না। তাই বুকভরা বেদনা নিয়ে তাকে চলে যেতে হচ্ছে।

উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরেও তিনি আন-ওয়ানটেড ছিলেন। সেখানেও তার স্টীল প্লান্টের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছিল। মানুষের প্রতিরোধ ভাঙ্গতে পুলিশ চোদ্দজন গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে সেখানে। এর পরেও তিনি সেখানে আন-ওয়ানটেড বোধ করেন নি! সেখান থেকে চলে যান নি।

নিছক আন্দোলনের কারণে একজন ব্যবসায়ী জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে এটা বিশ্বাস করা শক্ত। করপোরেট ডিসিসন এভাবে হয় না। এ ধরনের আন্দোলন করপোরেট ওয়ার্লডের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এসব ফালতু ঝামেলা। ব্যবসা করতে গেলে এমন দু'একটা ঝামেলা ফেস করতেই হয়। এমনটাই মনে করে তারা। ফলে সিঙ্গুর থেকে টাটা'র পাট গুটিয়ে নেওয়ার ডিসিসন আন্দোলনের কারণে হয়েছে এমনটা নাও হতে পারে। এর পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কারণ কিছু আছে। সেটা এখুনি জানা যাচ্ছে না। কোনো দিন হয়তো জানা যাবে।

অর্থনৈতিক মন্দার ঢেউ দেশ থেকে দেশে আছড়ে পড়ছে। তাতে অনেক কিছুর সাথে গাড়ির বাজারেও মন্দা দেখা দেবে সেটা আমরা না বুঝলেও ব্যবসা জগতের চাঁই-রা জানতেন। আশঙ্কা অবশেষে সত্যি হয়েছে। দুনিয়াজুড়ে গাড়ির বাজারে ধ্বস নেমেছে। সর্বত্র অবিক্রিত গাড়ির পাহাড় জমে উঠছে। ফোর্ড সহ অনেক কোম্পানীই বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা ঘোষণা করেছে। টাটা কোম্পানীর টেলকো কারখানাও মাঝে মধ্যে বন্ধ থাকবে বলে নোটিশ জারি হয়েছে।

পুরনো নামি-দামি কোম্পানীর গাড়িরই এই হাল। সেখানে নতুন গাড়ি নিয়ে বাজারে নামলে কি হাল হতে পারে সহজেই অনুমেয়। ফলে ন্যানো নিয়ে এক্ষুণি বাজারে না নামাই উচিত বলে সিদ্ধান্ত হয়ে থাকতে পারে। পেছিয়ে যাবার জন্য একটা যুৎসই অজুহাত হাতের কাছে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে গন্ডগোল। জমি নিয়ে আন্দোলন মিটছে না। তাই গাড়ি বার করা গেল না। ন্যানো গুজরাট থেকে বেরবে। এজন্য একটু সময় তো লাগবেই। সবাই বুঝবে কথাটা।

তবে এত দিনে শ্রী রতন টাটা বোধহয় ন্যানোর কথা ভুলেই গেছেন। কারণ ইতিমধ্যে আরও বড় বিপদ উপস্থিত তার সামনে। বিলেতে তাদের সদ্য অধিগৃহীত ল্যান্ড রোভার-জাগুয়ার কারখানায়ও সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই মন্দার বাজারে কে কিনবে ওই দামি গাড়ি? গাড়ির ডিলাররা তাদের লোকজনদের ছুটি দিয়ে শোরুমের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। জাগুয়ার বাঁচানর জন্য বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন টাটা। এক বিলিয়ন পাউন্ড অনুদান চাই। তা না হলে কর্মী ছাঁটাই হবে বলে দিয়েছেন। ফলে এই অবস্থায় টাটার ন্যানো নিয়ে ভাবার অবসর থাকার কথা নয়। কিন্তু বাংলা বাজারে ন্যানো নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর চলছেই।

র. চ.

দুই

মন্দাক্রান্তা যান-বাজার

গাড়ির উৎপাদন কমেছে এদেশেও। কী কারণে কমেছে তার ব্যাখ্যা এক এক মহলে এক এক ভাবে করা হচ্ছে, আমরা শুধু পরিসংখ্যানটা তুলে ধরছি।

পশ্চিমের দেশগুলোর গাড়ির বাজার বেশ কয়েক বছর ধরেই খারাপ। ভারত সহ পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশকে অটোমোবাইল শিল্প ও প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় বাজার হিসাবে ভেবেছিলেন অর্থনীতির পন্ডিতরা। আপাতত তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে হচ্ছে না। টাটা ,ফোর্ড, জি এম, স্কোডা ইন্ডিয়া -সব গাড়ি উৎপাদক কোম্পানিই গাড়ির দাম কমিয়েছে, অবস্থা সামাল দিতে। কিন্তু বাজার বাড়ছে না বরং কমছে। গত বছর নভেম্বর মাসের (২০০৭) সঙ্গে এ বছরের নভেম্বর মাসের (২০০৮) তুলনা করে সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স বা 'সিয়াম' এই হতাশাজনক হিসাব তুলে ধরেছে। সিয়াম-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আভ্যন্তরীন বাজারে (ব্যক্তি মালিকানায়) গাড়ির বিক্রি কমেছে ১৭.৯৮ শতাংশ। বানিজ্যিক বাজারে (প্রতিষ্ঠান / সংস্থায়) বিক্রি কমেছে ৪৯.৫২ শতাংশ, যাত্রিবাহী গাড়ির বিক্রি হ্রাস পেয়েছে ১৯.৩৮ শতাংশ। দু'চাকার মোটর গাড়ির বিক্রি পড়েছে ১৪.৬৮ শতাংশ।

ভারতের গাড়ি ব্যবসার বাদশা, মারুতি-সুজুকির গাড়ি বিক্রি কমেছে ২৪.৮৪ শতাংশ, হায়উন্দাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেডের কমেছে ২৩.৩২ শতাংশ। কিন্তু মজার তথ্য হলো, ন্যানোর গোলমালের মধ্যেও টাটা মোটরর্স -এর গাডি বিক্রি সামান্য হলেও বেড়েছে। শ.ন.

তিন

সন্ত্রাস এবং ব্যবসা

গুটিকয়েক ছোকরা কিছু অস্ত্রসস্ত্র আর গোলা বারুদ নিয়ে মুম্বাই রেল স্টেশনে, একটি বাড়িতে এবং গোটা তিনেক হোটেলে কি খেলটাই না দেখাল। টিভি চ্যানেলের অবিরাম প্রচারের দৌলতে তিন দিন ধরে পুলিশ, মিলিটারি, অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াড, স্পেশাল সিকিউরিটি গার্ড, ব্ল্যাক-ক্যাট, নেভাল-কমান্ডো-দের ছোটাছুটি ওড়া-উড়ির বিশদ বিরল দৃশ্য দেখা গেল। দুনিয়াজুড়ে সবাই দেখল। শুনতে পাই সাত তারা হোটেলে সিকিউরিটি বন্দোবস্ত নাকি এমন টাইট যে সেখান দিয়ে ছুঁচও গলতে পারে না। সেখান দিয়ে এত এত অস্ত্রসস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে ঢুকে পড়ল লোক! গার্ডরা কি ওগুলো আলুর বস্তা ভেবে গেটে ছেড়ে দিয়েছিল?

খবরে জানা গেছে এক একটি হোটলের দখল নিয়েছিল সাকুল্যে দুই কি তিন জনের দল। এই ক'জনেই কত কি করল! কত দিক সামলালো! হোটেলের চার পাঁচ'শ কামরার লোকজন ও হোটেলের শতখানেক কর্মচারিদের মেরে ধরে সায়েস্তা করল, বাইরের শত শত পুলিশ ও কমান্ডোদের ঠেকিয়ে রাখলো, হোটেলের নানান ফ্লোরে ঘুরে বেরালো, কখনো ওপর তলায় কখনো নীচের তলার ঘরে আগুন লাগালো কি গ্রেনেড ফাটাল। এরই মধ্যে সময় করে খাওয়া-দাওয়াও সারলো। ওদের সঙ্গেই নাকি ড্রাই ফুড প্যাক ছিল। এত কিছু করলো মাত্র দুই কি তিনটি লোক!

এই দু'তিন জনকে কব্জা করতে আমাদের হরেক নামের কমান্ডো বাহিনীর লাগল প্রায় তিন দিন। এরই মধ্যে প্রাণ হারাল শত খানেক লোক। যার মধ্যে কয়েকজন কমান্ডো বাহিনীর অফিসারও আছে। আসলে দেশের নেতা আর মন্ত্রীদের পাহারা দিতে দিতেই এদের দফা রফা। পাহারা মানে তো সেজেগুজে হাতে একটা রাইফেল নিয়ে নেতাদের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ানো। আর কাজ মানে রাস্তার ধারের লোকেদের চমক দেখানো। গোটা-টাই একটা সার্কাস। এর পরেও এদের পক্ষে মোটিভেটেড জেহাদিদের মোকাবিলা করা সত্যিই শক্ত। ফলে যা হবার

তাই হয়েছে।

কিন্তু বিপদ হয়েছে এই ঘটনার পর দেশজুড়ে আওয়াজ উঠেছে আমাদের সিকিউরিটি ব্যবস্থা নাকি বড়ই পলকা। একে ঢেলে সাজাতে হবে। মানে সিকিউরিটি বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। এবং এদের আরও ইকিউপ করতে হবে। এখনই সব মিলিয়ে এসব বাহিনীতে লোকের সংখ্যা ৪৫০০০। এর পেছনে বছরে খরচ ৮২৫,০০,০০,০০০ টাকা! এবারের হুজুগে নতুন দিক হল শুধু বর্ডার এলাকা নয়, দেশের গোটা সমুদ্রোপকূল ধরে পাহারাদারী বাড়াতে হবে। এজন্য চাই অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। মানে আধুনিক সিকিউরিটি ইকিউপমেন্ট। যা খুবই ব্যয়বহুল ব্যাপার। কিন্তু দুনিয়াজুড়ে এই যন্ত্রপাতির কারবারের রমরমা বাজার এখন।

সব দেশের নেতারাই হঠাৎ একযোগে বলতে শুরু করেছেন যে মানবজাতির সামনে আজ সব থেকে বড় সমস্যা হল সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের মোকাবিলার জন্য নানান বন্দোবস্তের সাথে ইলেকট্রনিক সারভিলিয়েন্সের যন্ত্রপাতি বসানোও খুব জরুরি। মুম্বাই হামলার পর দিল্লীতে মন্ত্রী এবং সিকিউরিটি কর্তাদের যে হারে মিটিং হচ্ছে তাতে বোঝাই যায় অচিরেই হাজার হাজার কোটি টাকার সিকিউরিটি যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হবে।

সব ব্যবসাতেই চাহিদা তৈরির জন্য একটা বিজ্ঞাপনের ব্যাপার আছে। সন্ত্রাসবাদীদের হামলার টিভি শোগুলোকে সিকিউরিটি ইকিউপমেন্টের চাহিদা তৈরির লাইভ বিজ্ঞাপন হিসেবে ধরা যেতে পারে। আনুমান করা হচ্ছে যে মুম্বাই-কান্ড ঘটানর জন্য সন্ত্রাসবাদীদের দশ কোটি টাকার মত খরচ হয়েছে। হাজার কোটি টাকার সিকিউরিটি ইকিউপমেন্টের ব্যবসার জন্য দশ কোটি টাকা মোটেই বেশি খরচ নয়। কারণ এই বিজ্ঞাপনই যদি মুম্বাইর চিত্রতারকাদের দিয়ে করাতে হতো তা হলে এর থেকে ঢের বেশি খরচ পড়তো। তার ওপর সেসব বিজ্ঞাপন অন্যান্য শো-এর ফাঁকে ফাঁকে খামচা খামচা করে দেখান হত। সন্ত্রসবাদী হামলার শোয়ের মত এমন আন-ইন্টারাপটেড শো হতে পারতো না। ফলে সব দিক বিচারে এটাই মোস্ট এফেকটিভ এবং ইকনমিক ওয়ে অফ অ্যাডভার্টাইজিং হয়েছে। এমন কি হতে পারে না সিকিউরিটি ইকিউপমেন্টের কারবারিরাই সন্ত্রাসবাদীদের স্পন্সরার?

র. চ.

চার

মুম্বাই কান্ড ও প্রো-অ্যাকটিভ মিডিয়া

বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের অ্যাঙ্কার-পারসন, রিপোর্টার ও ক্যামেরা-পারসনরা যেভাবে দিন নেই রাত নেই মুম্বাই-এর জঙ্গী হামলার খবর প্রচার করলেন তা এক কথায় অনবদ্য। অজস্র টিভি চ্যানেল জড়ো হয়েছিল সেখানে। সবাইকেই সবার আগে খবর ছাড়তে হচ্ছিল। সে এক ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা। সবার খবরই প্রথম। সব্বাই বলছে আমরাই প্রথম এ খবর দিচ্ছি!

শুধু খবর নয়, এরই ফাঁকে ফাঁকে চলছিল জনমত গঠনের কাজ। এসবের জন্য কে বা কারা দায়ী খোঁজা চলছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধরে ধরে ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছিল। পথ চলতি মানুষজনদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। অবাক কান্ড, দেখা গেল ব্যতিক্রমহীনভাবে সবাই পলিটিসিয়ানদের মুন্ডুপাত করছেন! সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। কি তেজোস্বী ভঙ্গী ও ভাষা সবার! তাজ চত্বরেই পথচারি এক মহিলাকে এই ব্যাপারে কিছু বলতে বলা হল। মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরতেই মহিলা চিৎকার করে বলে উঠলেন পলিটিসিয়ানদের ধরে ধরে খুন (কিল) করা দরকার!

রাজনৈতিক নেতারা সব ব্যাপারেই মতামত দিয়ে থাকেন। এইবার দেখা গেল তারা প্রায় চুপচাপ। একটু ভড়কে গিয়েছিলেন বোধহয়। হাওয়া খারাপ বুঝে মুখ না খোলাই ভাল বিবেচনা করেছিলেন। একজন ব্যতিক্রমী আছেন দেখা গেল। বিজেপি'র একজন নেতাকে মুখ

খুলতে দেখা গেল। সাধারণ মানুষের এই প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে ওনার কি বলার আছে জানতে চাওয়া হলে উনি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠেন যে ঠোঁটে লিপস্টিক-মাখা মহিলারা কি বলল তাতে তার কিছু যায় আসে না! অর্থাৎ তিনি নিশ্চিত যে কপালে তিলক-কাটা বজরঙ দলের সদস্যরা যতক্ষণ তার সহায় আছে ততক্ষণ ভাবনার কিছু নেই। র. চ.

পাঁচ

উপকূল বাঁচাও

ভারতের শতকরা ২৫ জন মানুষের বাস উপকূলের ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে। শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য হোটেল রিসর্ট, মাছের ও চিংড়ির ভেড়ি বেড়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে, জনবসতির ঘনত্ব বেড়েই চলেছে। এবং এসবই ঘটছে, ঘটে চলেছে উপকূল রক্ষার আইন থাকা সত্বেও।

পরিবেশ আইন, ১৯৮৬'র অধীনে বন ও পরিবেশ দপ্তর উপকূল রক্ষার উদ্দেশ্যে আইনী বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল - পোষাকী নাম ছিল - উপকূল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তি (Coastal Regulation Zone Notification। তাতে অন্তত জাতীয়ভাবে উপকূল সুরক্ষায় সদিচ্ছার ছাপ স্পষ্ট ছিল।

কিন্তু ভারতে যেমনটা সাধারণত হয়েই থাকে - আইন হলেও তার রূপায়ণে কর্তারা আন্তরিক থাকেন না - এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হলো না। একের পর এক আইন লঙঘনের ঘটনা ঘটেই চললো, বাধা দেওয়ার বদলে সেগুলি থেকে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে তোলা আদায় চলতেই থাকলো। দীঘার কাছে মান্দারমনি কলকাতা ও অন্যত্র বড় বড় হোর্ডিং-এ পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানায়। কজনই বা জানে যে সম্পূর্ণ বেআইনী এই রিসর্ট, কাদের প্রশ্রয়ে কিভাবে গড়ে উঠলো একেবারে সমুদ্র-সৈকতের কোল ঘেঁসে? মামলা চলছে - হাইকোর্টে। সে চলুক, চলুন বেরিয়ে আসি! এমন ঘটনা দেশ জুড়ে শত শত। রাজনীতির কেষ্টবিষ্টুদেরও অনেকে জড়িত এসব ব্যবসায়।

ইতিমধ্যে আইনী বিজ্ঞপ্তি - সি আর জেড নোটিফিকেশনের সংশোধন ঘটতেই থাকে। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ এর ১৭ বছরে ২১ বার সংশোধিত হয়ে, এখন এসেছে সি এম জেড নোটিফিকেশন (CMZ Notification বা Coastal Management Zone Notification । নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বা Regulation Zone পরিবর্তিত অভিধায় ব্যবস্থাপনা অঞ্চল বা Management Zone হয়ে যেতে চায়। রূপও বদলাবে, এলাকা নতুন ভাবে চিহ্নিত হবে, ব্যবসা-কারবার যেসব এলাকায় নিষিদ্ধ ছিল, সেসব এলাকায় নিয়ন্ত্রিত কারবারের ছাড় থাকবে। বেসরকারী মালিক থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সবাই আশায়। পুরনো বেআইনী কাজকারবারগুলি এবার আইনী বৈধতা পেয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন প্রবল আশায়, নতুন উদ্যমে নয়াচরে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী। CRZ- এর কবলে থাকলে যে অসুবিধা ছিল, CMZ-এ সে অসুবিধা আর থাকবে না, মাভৈঃ।

১৯৯১-এর বিজ্ঞপ্তিতে সুরটা ছিল- স্পর্শকাতর এবং প্রচন্ড উৎপাদনশীল ইকোসিস্টেম হিসেবে উপকূল সংরক্ষণের। তার পর প্রতিটি সংশোধনীতে সে সুর নরম করা হয়েছে। CMZ বিজ্ঞপ্তি সেসবের পরিণতি। রাজ্যে রাজ্যে একটি করে ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (ICZMA থাকবে, তারাই 'ব্যবস্থাপনার' পরিকল্পনা ও দেখভালের দায়িত্বে থাকবে। এরাজ্যেও একটি ICZMA আছে, নয়াচরের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই তারা উদার।

বিশ্বজুড়ে আজ আওয়াজ উঠেছে ইকোসিস্টেমের যথাযথ সুরক্ষার জন্য স্থানীয় চিরাচরিত অধিবাসী যারা, যাদের জীবন-জীবিকা সংস্কৃতি প্রকৃতির তালে ছন্দে সুঠাম সম্পর্কে সংপৃক্ত তাদের অধিকার স্বীকার করে, উন্নয়ন - ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশীদারিত্ব-কে প্রাধান্য দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপায়ণের পথে এগোতে হবে। এমত ভাবনার সূত্রেই আজ ভারতেও বনবাসীরা কিছুটা হলেও আইনী অধিকার লাভ করেছেন। নতুন অরণ্য ব্যবস্থাপনায় তাদের অধিকার কিছুটা

স্বীকৃত হয়েছে, যদিও তার রূপায়ণের পথে এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে, কিন্তু আইনী স্বীকৃতিটুকুতো তার প্রথম ধাপ। আশ্চর্যের বিষয়, ২০০৫-এর অরণ্য- বিষয়ক আইনের যে নীতির পক্ষে ছিল কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক, ২০০৮ CMZ এর বিজ্ঞপ্তিতে তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন দেখা গেল না। CMZ বিজ্ঞপ্তিতে ভারতের প্রায় ৭৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল বরাবর বিভিন্ন ভাষাভাষী মৎস্যজীবি সম্প্রদায় - দরিদ্র এবং চিরাচরিত সেসব গোষ্ঠীর প্রায় সওয়া কোটি মানুষ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হলেন। CMZ বিজ্ঞপ্তি বিষয়ে জনসাধারণের বক্তব্য জানার জন্য তাই ইংরেজী ও হিন্দী ছাড়া অন্য ভাষার স্থান নেই। যারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছেন, তাদের আইন বিষয়টা জানানোরও কোন ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেই। রাজ্যে রাজ্যে তাই প্রথাগত মৎস্যজীবির সম্প্রদায় ভীত সন্ত্রস্ত, আন্দোলিত। তাঁরা আন্দোলন করছেন। কয়েকবছর আগের ভয়াবহ সুনামির জন্য বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞরা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেছিলেন - উপকূলের প্রাকৃতিক সুরক্ষা বলয় - যেমন লবনাম্বু অরন্য (Mangrove forest ইত্যাদির ধ্বংস যদি অব্যাহত থাকে, তবে আরও ভয়াবহ সুনামির কালগ্রাস থেকে বাঁচবে না পৃথিবী। কিন্তু আমরা যেন উল্টোপথেই হাঁটতে চাই - সুনামির থাবায় উচ্ছিন্ন মৎস্যজীবিদের আর উপকূলের কাছাকাছি ঘেঁসতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা বিপন্ন। নাগরিক সমাজের চুপ করে থাকাটা এখানেও মৃত্যুকে ডেকে আনার সামিল। জমি, জঙ্গল, জল, উপকূল, আকাশ - সর্বত্র পুঁজির কর্মকান্ডের একাধিপত্য বিস্তার - প্রাকৃতিক ও প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা মানুষ সহ সমস্ত জীবকূলের সংহার কোন ভবিতব্যের ইঙ্গিত? তাই নাগরিক সমাজেরও সোচ্চার হওয়া খুবই প্রয়োজন। ভেবে দেখুন, ভারতীয় উপকূলবাসী মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে পারি কিনা

- মাছ ও জীববৈচিত্রের আঁতুরঘর উপকূল বাঁচাও।
- মৎস্যজীবি ও অন্যান্য স্থানীয় প্রথাগত অধিবাসীদের অধিকার স্বীকার করো।
- CMZ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করো।
- ম্যানেজমেন্টের টেকনিক্যাল কচকচি কে প্রধান্য না দিয়ে ১৯৯১-এর সুরে উপকূল সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করো।
- বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে উপেক্ষা কোরো না, উপকূল রক্ষায় পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরী করো।

র. ম.

ছয়

নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের গল্প ঃ

২০০৮ নিউক্লিয়ার শক্তির ফেরিওয়ালাদের পক্ষে কালা সাল হিসেবে চিহ্নিত [illegible] করবে। নভেম্বর ৯, ২০০৮ - এ প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে রাশিয়ার একটি নিউক্লিয়ার শক্তি পরিচালিত সাবমেরিনে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই ২০ জন মৃত্যুবরণ করে - আরও ২২ জন মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এঁদের বেশির ভাগেরেই অবস্থা সংকট জনক - যদি চিকিৎসাশাস্ত্রের কারিকুরিতে তাঁরা এযাত্রায় বেঁচেও যান তবে তেজস্ক্রিয়তার জন্য তাঁদের ক্যানসারে মৃত্যু প্রায় ভবিতব্য।

নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির দিন দিন সুরক্ষাবৃদ্ধির যে গল্পকথা আমরা প্রতিটি দুর্ঘটনার পর শুনছি - এক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাশিয়ার বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঘটনা সামান্য - দৈবাৎ ঘটে গেছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের কমিটি শেষ পর্যন্ত মূল বিষয়টিকে জনসমক্ষে এনেছে। একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, যেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হওয়া উচিত ছিল, তা চালু হয়নি। নেরপা নামক এই সাবমেরিনটি আকুনা-দুই প্রজন্মের সাবমেরিন - এবং বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী আক্রমণাত্মক সাবমেরিন। এহেন একটি সাবমেরিন অগ্নিকান্ডের ফলে (মনে রাখতে হবে এই অগ্নিকান্ড ঘটেছে জলের তলায় ডুবোজাহাজটির সামনের দিকটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে - এতটাই যে তাকে সেনাবাহিনীর একটি অস্থায়ী বন্দরে এনে সারাই-এর কাজ করতে হয়েছে। যথারীতি শোনা যাচ্ছে যে নিউক্লিয়ার চুল্লির কোনো ক্ষতি হয়নি - কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা কতটা নির্গত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো তথ্যই প্রকাশিত হয়নি।

রাশিয়ার সাবমেরিন সংক্রান্ত দুর্ঘটনার ইতিহাস খুব একটা সুখকর নয়। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারীর ২৬ -এ এই

একই অস্কার - দুই প্রজন্মের একটি রাশিয়ান সাবমেরিনের নিউক্লিয়ার চুল্লির শীতল করার ব্যবস্থায় গোলোযোগের ফলে গ্যাসীয় শীতকবাহী একটি নল ফেটে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস নির্গত হয়। ৫জন অতি সিনিয়র অফিসার শ্বাস কষ্টে আক্রান্ত হন - এর মধ্যে ক্যাপ্টেনে পদমর্যদার একজন অ্যামোনিয়া বিষক্রিযায় মারা যান।

২০০০ সালের ১১ই আগষ্ট (সম্ভবত রাতভোরে রাশিয়ার কুরস্ক সাবমেরিনটি, রাশিয়ার মুরমানস্ক বন্দর থেকে ১০০ কিমি দূরে ডুবে যায়। ১৫ই আগষ্ট জানা যায় যে কুরস্ক সাবমেরিনটির যেখানে টর্পেডো রাখা ছিলো, সেই প্রকোষ্ঠে ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য সাবমেরিনটি ডুবে গেছে। বন্দরে ফিরছিলো বলে কুরস্ক তার নিউক্লিয়ার অস্ত্রগুলো অন্য একটি সাবমেরিনে চালান করেছিল। একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে কুরস্ক সাবমেরিনটির দুটি নিউক্লিয়ার চুল্লির গুরুতর ক্ষতি হয়েছে - এবং সম্ভবত তা তেজস্ক্রিয় বস্তু সমুদ্রে ছড়াচ্ছে। আজ পর্যন্ত এই ডুবে থাকা সাবমেরিন থেকে তেজস্ক্রিয় বস্তু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ১১৮ জনের প্রত্যেকেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। পুরো বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায় কারণ রাশিয়া এই উদ্ধারকার্যে নরওয়ে এবং শেষ পর্যন্ত ন্যাটো-গোষ্ঠির সাহায্য প্রার্থনা করে। রাশিয়া যে নিজের থেকে উদ্ধারকাজ চালাতে পারেনি তার কারণ হলো উদ্ধার কাজের জন্য রাশিয়ার যে সমস্ত সাবমেরিন ছিলো, আর্থিক দিক থেকে বাহুল্য মনে হওয়ায় রাশিয়া আর সেগুলোকে ব্যবহার করছে না। এমন কয়েকটা অব্যবহৃত নিউক্লিয়ার শক্তি পরিচালিত সাবমেরিন রাশিয়া সম্প্রতি ভারতকে বিক্রি করেছে - ভারত -মার্কিন দ্বিপাক্ষিক পরমানু চুক্তির ফলে। কেননা রাশিয়া নিউক্লিয়ার সাপ্লাই গ্রুপের সদস্য হওয়ায়, এবং আই এইএ ভারতকে ছাড় দেওয়ায় ভারতের সঙ্গে এসব বেচাকেনার ওপর আর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

রাশিয়ার নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন বা নিউক্লিয়ার শক্তি পরিচালিত বস্তুর ডাস্টবিন হয়ে উঠেছে ভারত। চের্নোবিলে যে প্রজন্মের নিউক্লিয়ার চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটেছিলো - ভারত সেই প্রজন্মের নিউক্লিয়ার চুল্লি বসাচ্ছে কোদানকুলমে। রাশিয়ার তামাদি হয়ে যাওয়া, বাতিল, দুর্ঘটনা প্রবণ সাবমেরিন এখন ভারতকে বিক্রি করছে। এরপর আসছে তথাকথিত তৃতীয় প্রজন্মের নিউক্লিয়ার চুল্লি - জলে ভাসমান ফ্লোটিলা। আগামী কয়েক বছরে ভারত এমন অনেক সন্দেহজনক বস্তু রাশিয়া থেকে কিনবে। আমরা মারী-মন্বন্তর নিয়ে ঘর করতে অভ্যস্ত - ভয় কি মরণে!

শু.মু.

সাত

নিউক্লিয়ার কিস্‌সা

নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রযুক্তি যত দক্ষ হচ্ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে দুর্ঘটনাও বাড়ছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই এই দুর্ঘটনার কারণ যতটা না প্রযুক্তির ব্যার্থতা, তার চেয়েও বেশি দায়ী মানুষের ভুল। রাসমিউসেন সাহেব এম আই টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চালিয়ে "প্রমাণ" করেছিলেন যে, উড়োজাহাজে দুর্ঘটনা, ট্রেনে দুর্ঘটনার পরিমাণ এবং তার মোট সম্ভাবনা নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে দুর্ঘটনার মোট সম্ভাবনার চেয়ে বেশি। বস্তুত সেই চর্বিত-চর্বণ থ্রি-মাইল আইল্যান্ড আর চের্নোবিল দুর্ঘটনা ছাড়া আমাদের মতো নিউক্লিয়ার শক্তির বিরোধী (ফলে কি উন্নয়ন - বিরোধী? মানুষদের ঝুলিতে আর কি-ই বা আছে? কিন্তু রাসামিউসেন সাহেবের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে উন্নত প্রযুক্তির দেশ জাপান-জার্মান-মার্কিন-ইংল্যান্ডে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা অব্যাহত। ভুবনায়নের ধাক্কায় বেসরকারীকরণের হিড়িক যত বাড়ছে, দুটো কিনলে একটা "ফ্রি" - এই হজুগ যখন "এইডস্" রোগের মতো সর্বব্যাপী রূপ পরিগ্রহ করবে (তার সমস্ত সংকেত সুস্পষ্ট - তখন খরচ কমানোর উদগ্র তাড়নায় সমস্ত রকমের সুরক্ষা যে মা-গঙ্গার পূণ্য বক্ষে নিক্ষিপ্ত হবে তাতে আর সন্দেহ কি!

নভেম্বর ১৩, ২০০৮ - এ জাপানের বেসরকারী নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা - তোহোকু ইলেকট্রিক পাওয়ার কম্পানী অনেক টালবাহানার পর তাদের মিয়াগি

প্রিকেক্চার - এ ওনাগাওয়া নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটা ''সামান্য'' দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করে! তাও তারা চেপে যেতো - কিন্তু এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (যথারীতি অস্থায়ী এবং চুক্তির ভিত্তিতে কর্মরত একজন শ্রমিক ভয়াবহ ভাবে পুড়ে যাওয়ার ফলে তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। তখন জানা যায় যে, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে অংশে নিউক্লিয়ার চুল্লির ''কোর'' অংশটি ছিলো, সেই বাড়িটিতে আগুন লেগে যায়। আগুন যখন লাগে, তখন আগুন লাগার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নজরে আনার যন্ত্রটি বিকল ছিলো - গত কয়েকমাস যন্ত্রটি রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। এই বেচারা শ্রমিকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঐ ভবনটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আগুন দেখতে পেয়ে সনাতনী পদ্ধতিতে, অর্থাৎ জল, বালি ইত্যাদি দিয়ে অক্সিজেনের যোগান কমানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে গিয়ে গুরুতরভাবে পুড়ে যায়।

ভয়ানকভাবে স্বয়ংক্রিয়, স্বনিয়ন্ত্রিত, ''অত্যাধুনিক প্রযুক্তি'' দ্বারা সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাটির অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাটি একেবারেই সাবেকী। আগুন লাগার খবর পৌঁছোতে লাগে ২০ মিনিট - আগুন নেভাতে লাগে ৫০ মিনিট! পরে কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে আগুন লাগার অন্যতম কারণ হলো, ওয়েল্ডিং যখন চলছিলো তখন আগুনের ফুলকির শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ফিলটারের জন্য ব্যবহৃত শীতকে আগুন লাগে। লাগার কথা ছিলো না - কেননা শীতকে যাতে কোনো দাহ্য গ্যাস না ঢোকে তার জন্য ''অত্যাধুনিক'' প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। তবে কিনা যে ব্যক্তিটির এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে চলা ''ফ্লেমেবেল গ্যাস ডিটেকটর'' টি চালানর কথা এবং সেই অনুসারে বাকীদের সতর্ক করার কথা-তিনি পরব উপলক্ষ্যে ছুটিতে - ফলে এই বিপত্তি!

জাপানের তোহোকু-র এই ওনাগাওয়া নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি ইউনিট রয়েছে - তিনটি ইউনিট সম্মিলিত ভাবে ২১৭৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে। যে ইউনিটটিতে আগুন লাগে সেটি ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে নিউক্লিয়ার জ্বালানী ভরার জন্য এবং প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ ছিলো - কিন্তু অন্য দুটি ইউনিট চালু অবস্থাতেই ছিলো। আগুন নেভাতে আর ১৫ মিনিট বেশি সময় লাগলে চালু দ্বিতীয় ইউনিট-এ আগুন ছড়াতে পারতো।

জাপানে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিধ্বংসী দুর্ঘটনা প্রায় লাগাতার। টোকাইমুরা বা মিনাগা দুর্ঘটনা তীব্রতার দিক থেকে ভয়ানক। চের্নোবিলের পরও রাশিয়ার দুর্ঘনার কমতি নেই। বছরে এখনও গড়ে ১.৭ টি নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনা ঘটে যেগুলো মারাত্মক থেকে অতিমারাত্মক দুর্ঘটনা হতে পারতো - কেবল আকস্মিকভাবেই তা ঘটেনি। পৃথিবীতে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের সংখ্যা যত বাড়বে - প্রতিযোগিতা যত বাড়বে, নজরদারী যত কমবে, ততই দুর্ঘটনা-প্রবণতা বাড়বে।

আমরা তো দেখলাম ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক পরমাণু চুক্তিতে আইএইএ নিউক্লিয়ার চুল্লির নজরদারীতে সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতকে ছাড় দিয়েছে - প্রায় একই রকমের ছাড় চীনও পেয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্থানসহ অন্যান্য দেশগুলোও পেতে পারে।

২০০৯ তাই নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে অশনিসংকেতবাহী। **শু. মু.**

আট

চীনের মেলামিন রহস্য

চীন দেশে অলিম্পিকের পর এখন শিশুমৃত্যু নিয়ে তোলপাড়। না, কোনো আকস্মিক মড়ক, সাম্রাজ্যবাদীদের কোনো জীবানু-যুদ্ধের বীজানু চীনের শিশুদের মৃত্যুর কারণ নয়। কারণ আরও গভীর - তাই তার আলোচনাও জরুরী।

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৮ থেকে দেখা যাচ্ছিল চীনের হাসপাতালগুলোতে অসুস্থ শিশুদের ভীড় - সংখ্যাটা চীন দেশের পক্ষেও ভয়াবহ। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে এসে দেখা যায় যে একমাসেই ১৩,০০০ শিশু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি - অসুস্থ শিশুর সংখ্যা ততদিনে ৫৪,০০০ ছুঁই ছুঁই। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেলো যে এই শিশুরা, রাষ্ট্রের দ্বারা সার্টিফিকেট

প্রাপ্ত, শিশুদের জন্য গুঁড়ো দুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চীনের বেসরকারীকরণের ঢেউ-এ ইন্দোনিশিয়ার একটি সংস্থা সারা দেশব্যাপী এই দুধ সরবরাহ করেছে। শিশুমৃত্যুর বিষয়টি চীনা সরকারের নজরে এসেছিল অলিম্পিক চলকালীন সময়ে, কিন্তু পাছে অলিম্পিকের জাঁক-জমকের বিঘ্ন ঘটে - এতজন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের কাছে বেইজ্জত হতে হয় - তারা বিলকুল নিঃশুপ ছিলো এবং পরিহার্য মৃত্যুর মিছিল নিশ্চিন্তে বাড়তে দিয়েছে।

শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ এই ঘটনাটিই চীনের বর্তমান অভ্যন্তরীন শাসনব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থা এবং কৃষ্টির মধ্যে যে কোনো একটা গোলমাল ঘটছে, কোনো এক ঘুনপোকা এই ব্যবস্থার গোড়া কাটতে শুরু করেছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে। শিশু মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে ধরা পড়লো যে চীনেও দুধে ভেজাল রয়েছে এবং তা আমাদের ছোটোবেলায় পার্টিগণিতের অংকের দুধে জল মেশানোর মত নিরামিষ ভেজাল নয়। এ এক আটঘাট বেঁধে, বৈজ্ঞানিকভাবে, গবেষণাপ্রসূত ভেজালের কারবার।

চীন দেশে দুধের ঘনত্ব এবং তাতে প্রোটিনের পরিমাণ মেপে শিশুখাদ্য হিসেবে সার্টিফিকেট দেওয়ার পদ্ধতি সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় থেকে চলে আসছে - কমিউনগুলো এমন নজরদারি চালাতো সেই সময়। পরে বেসরকারীকরণের ধাক্কায় সেই সার্টিফিকেট প্রদানের পদ্ধতি বহুল পরিমানে কেন্দ্রীভবন ঘটে যায় - স্থানীয় স্তরের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে হতে সেই নিয়ন্ত্রণ কমিউনস্তরের হাতের বাইরে চলে যায়। কেন্দ্রীয় সার্টিফিকেট বাগাতে পারলেই তাই আধা-সরকারী, আধা-বেসরকারী, বেসরকারী এমনকি বিদেশী সংস্থাগুলো মহামন্দে ব্যবসা চালাতে পারে।

শিশুমৃত্যুর তদন্তে ধরা পড়েছে যে চীনে কৃত্রিমভাবে দুধের ঘনত্ব এবং তাতে প্রোটিনের পরিমাণ কৃত্রিমভাবে সরেস দুধের মতো দেখানোর জন্য মেলামিন নামক একটি প্লাস্টিক জাতীয় যৌগ ভেজাল হিসেবে মেশানো হয়। মেলামিনে নাইট্রোজেন রয়েছে প্রচুর - এবং এখন পর্যন্ত, প্রোটিনের পরিমাণ নির্ধারণে দুধে নাইট্রোজেনের উপস্থিতিরই পরিমাপ করা হয়! এই মেলামিন প্রাণীদের জন্য কোনো খাদ্যবস্তু নয় - প্রাণী মেলামিন হজম করতে পারেনা; এই মেলামিন মানুষের কিডনীতে জমতে থাকে এবং কিডনী সংক্রান্ত অসুখে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু অবধারিত। এই মেলামিন আকস্মিকভাবে দুধে মেশার কোন সম্ভাবনা নেই - দুধ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির কোনো স্তরেই মেলামিন মিশে যাওয়ার কোনো কারণই নেই। যে পরিমাণ মেলামিন এই সমস্ত ভেজাল দুধগুলো থেকে পাওয়া গেছে তা থেকেও বোঝা যাচ্ছে তা প্রাকৃতিকভাবে অশুদ্ধতার কারণে যতটা মিশতে পারে বলে অনুমান করা সম্ভব তার কয়েকশো গুণ। অর্থাৎ ভেজাল হিসেবে ব্যবহারের অভিপ্রায়েই মেলামিন কে দুধে মেশানো হয়েছিল।

মজার বিষয় হলো তেংসিয়াও পিং মহাশয় যখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ইঁদুর ধরার দৌড়ে রং না দেখেই বেড়াল ধরার নিদান দিচ্ছিলেন তখন থেকেই এই সমস্ত আজব কান্ডকারখানা চীনে শুরু হয়েছে। চীনের শিল্প উৎপাদনের এমন রমরমা সময়েও এই মেলামিন নামক বস্তুটির প্রায় কোনো শিল্প চাহিদা নেই - অথচ ১৯৮০ সাল থেকেই চীন এককভাবে সারা এশিয়ায় সর্ববৃহৎ মেলামিন আমদানি করে চলেছে। ভেজাল দেওয়ার তাগিদ ছাড়া এমন বেহিসেবী আমদানির কোনো ব্যাখ্যা নেই। ভেজাল-আক্রান্ত শিশুদের ২০০ জন মৃত, ৩০,০০০ জন স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

"সানলু" নামে ইন্দোনেশিয়ায় পঞ্জীকৃত যে বেসরকারী সংস্থাটি এই দুধ সরবরাহ করেছে - সেই সংস্থাটি কবুল করেছে যে তারা জানতো যে তারা দুধে মেলামিন মেশাচ্ছে এবং এই মেলামিন মিশ্রিত দুধ, যা দুধের গুণবিচার পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বাজারে চালান করছে, তা খেলে বাচ্চারা শেষ পর্যন্ত কিডনীর রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করবে।

চীনের মতো একটা গণপ্রজাতন্ত্রে যখন এমন এক ঘটনা ঘটে তখন বুঝতে হবে ব্যবস্থার মধ্যে ভূত ঢুকেছে - সেই ভূত তাড়ানোর আশু নিদান প্রয়োজন। এই ভেজালের বিষয়টি একটিমাত্র ঘটনা এমন নয় - আড়াই দশক ধরে চীনে এমন

নানান কান্ড ঘটে চলেছে। চীনে প্রস্তুত বাচ্চাদের খেলনা তৈরির মালপত্রে দেখা গেছে আসলে শিল্প বা শহরের বর্জ্য পদার্থ - তাতে ভরা ধাতু, এমনকি রাসায়নিক বিষও পাওয়া গেছে। কানাডাসহ পৃথিবীর অনেক দেশ চীনের খেলনা নিষিদ্ধ করেছে। মার্কিন দেশ ও জার্মানী চীনের টমেটোতে বিষ পেয়েছে। মনে রাখতে হবে চীনের আম-জনতা এখনও এই সমস্ত দ্রব্যগুলো ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে। চীনের বিশেষ আর্থিক অঞ্চলের সুতীব্র শোষণ ইত্যাদির কাহিনী সুপরিচিত। চীনের টর্চ, ব্যাটারী, ইত্যাদি সৌখিন দ্রব্যাদি কিনবার সময় একবার ভেবে নেবেন বাড়িতে প্রসব "টাইম বম্ব" পুষবেন কিনা! **শু. মু.**

নয়

গণপ্রতিবাদে চিন সরকার পেট্রোকেমিক্যাল কারখানার পরিকল্পনা বাতিল করল

চিনের ফুজিয়ান (Fujian এর অন্তর্গত জিয়ামেন (Xiamen শহরে ২০০৭ এর জুন মাসে দশ হাজারেরও বেশী মানুষ গণ-পদযাত্রায় (Collective walk অংশ নেন। তাঁদের দাবী জিয়ামেনে পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা স্থাপন করা চলবে না, কারণ এটা নাগরিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক এবং বন্দর শহরটার সৌন্দর্য নষ্ট করবে। শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষরাই ছিলেন এই পদযাত্রার উদ্যোক্তা এবং অংশীদার। এবং মোবাইল ফোন এস এম এস এবং ই-মেলের মাধ্যমেই তাঁরা সহ নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে এই পদযাত্রার আয়োজন করেন। পদযাত্রা হয় অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও নিরুত্তাপভাবে। এবং কি আশ্চর্য, সরকার পেট্রোকেমিক্যাল কারখানার নির্মাণকাজ বন্ধ রেখে, নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ দ্বারা প্রকল্পের পরিবেশ প্রভাব পর্যালোচনার আদেশ দেন। নাগরিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি গণশুনানিরও আয়োজন হয় এবং অবশেষে ২০০৭ এর ডিসেম্বরে নাগরিকদের যুক্তি ও মত গ্রহণ করে দেড়শো কোটি ডলারের প্রকল্পটি প্রত্যাহার করে নেন।

এই ঘটনায় চিনে এবং চিনের বাইরে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছে। কেননা, সাম্প্রতিককালে শিল্পাদির জন্য জমি অধিগ্রহণ বা বস্তি উচ্ছেদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কঠোর দমন-পীড়ন চালিয়ে কাজ হাসিল করাই চিনা দস্তুর হয়ে উঠেছিল। শিল্প বা অন্য যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মানুষদের সম্যক অবহিত করারও প্রয়োজন বোধ করত না সরকার। অথচ জিয়ামেন এর শহুরে নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকারের দাবী সরকার কেন উপেক্ষা করতে পারল না তা নিয়ে একরকম গবেষণাই শুরু হয়ে গেছে।

কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর চাইনিজ স্টাডিজ এর প্রধান অধ্যাপক রিচার্ড বাউম-এর মতে এই তথ্য - বিপ্লবের যুগে সরকারের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠোর হাতে বিক্ষোভ দমন আর সম্ভব হচ্ছে না। এতে চতুর্দিকে সোরগোল ওঠার প্রভুত সম্ভাবনা, বিশেষ করে যদি শহুরে শিক্ষিত মানুষরা এতে জড়িত থাকেন। কেননা তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক প্রকরণ তাঁদের করায়ত্ব।

অধ্যাপক বাউমকে অস্বীকার না করেও বোধহয় বলা যায় যে সমালোচনা বা বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভবনা চিন সরকারকে যতটা না বিচলিত করেছে, তার চেয়েও বেশী কাজ করেছে সাম্প্রতিক অতীতে পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে দুর্ঘটনা এবং তার থেকে সৃষ্ট মারাত্মক দূষণ।

২০০৫-এর ডিসেম্বরে জিলিন শহরের কাছে পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ ঘটে এবং প্রায় একশো টন বেনজিন ও নাইট্রোবেনজিন জিলিন নদীতে গিয়ে পড়ে। প্রথমে ঘটনাটি চেপে যাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পানীয় জলের আকাল সৃষ্টি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করা হয়। জিলিন নদীর জলকে শোধন করেই শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হতো, সেটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নদীর উপরে আশি কিলোমিটার একটি সর-বেনজিন ও নাইট্রোবেনজিন সমৃদ্ধ - ভাসতে থাকে এবং স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে। পথে হার্বিন (Harbin এবং হাইলংজিয়াং (Heilonjiang এর মত বড় শহরও পানীয় জলের সংকটে পড়ে যায়। কারণ ঐ শহরগুলিতেও পানীয় জলের ব্যবস্থা

জিলিন নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। প্রায় একমাস ধরে নদীর সঙ্গে ভাসতে ভাসতে এগোতে থাকে বিশাক্ত রাসায়নিকের ঐ সর। শেষে আমুদারিয়া পেরিয়ে রাশিয়ার সীমান্ত শহরে পৌঁছায়, অতিক্রম করে প্রায় পনেরশো কিলোমিটার পথ। তখনও জলে বেনজিন - নাইট্রোবেনজিনের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী। দুদেশের মধ্যে শুরু হয় টানাপোড়েন। চিন রাশিয়াকে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। চিনা মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। চিনের পরিবেশ সুরক্ষা এজেন্সী শেষে দোষ স্বীকার করে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের প্রতিশ্রুতি দেয়। কাজেই, মনে হয, জিলিনের এই দুর্ঘটনা ও দূষণের দগদগে ঘা - চিন সরকারকে অনেকটাই বাধ্য করেছে জিয়ামেন-এর নাগরিকদের কথা শুনতে। আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারও কি চিনের এইসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক পদক্ষেপ নেবেন, নাকি মানুষকে মেরে বিপদগ্রস্ত করে তবেই তাঁদের বোধোদয় হবে! (তথ্যসূত্র ঃ The Statesman, ফেব্রুয়ারী ১, ২০০৮ এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট র. ম. দশ

মিডিয়ার অন্দরমহল

আজকের দিনে মানুষের ভাবনা চিন্তার অনেকটাই কন্ট্রোল করে মিডিয়া। প্রিন্ট এবং টিভি উভয় মিডিয়াই। মিডিয়া মাত্রেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানা। কারা এই মালিক বা গোষ্ঠী জানতে ইচ্ছে করে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঠিকঠাক খবর জানা শক্ত। এই নিয়ে নানান প্রচার আছে। সত্য মিথ্যে জানা নেই। বাজারে উড়ে বেড়ানো কয়েকটা খবর দেওয়া যায়। যেমন, টাইমস নাউ হল টাইমস গ্রুপের চ্যানেল। মালিক বেনেট অ্যান্ড কোলম্যান। ওয়ার্লড ক্রিস্টিয়ান কাউন্সিলের মেজর শেয়ার রয়েছে এতে। কুড়ি শতাংশ শেয়ার আছে একজন ইংরেজ ও একজন ইটালিয়ানের। ইটালিয়ান ভদ্রলোক হলেন রাবার্টিও মিন্ডো। ইনি শোনা যায় শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধীর কেমন আত্মীয়। সিএনএন-আইবিএন হল মার্কিন যুক্তরাজ্যের সাউদার্ন ব্যাপটিস্ট চার্চের চ্যানেল। এর প্রধান হলেন রাজদীপ সরদেশাই। এনডি টিভি হল স্পেনের গসপেল অফ চ্যারিটিজের চ্যানেল। এরা নাকি আবার কমিউনিস্ট আদর্শে আস্থাশীলী! এদের চ্যানেলের প্রধান হলেন সিপিএম পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রকাশ কারাতের শ্যালক শ্রী প্রণয় রায়। শোনা যায় এনডি টিভি-গোষ্ঠী সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডে সাপ্তাহিক কাগজটি কিনে নিয়েছে। যেটা বিজেপি ঘেঁষা কাগজ বলে লোকে বলতো। স্টার টিভি'র মালিক হলেন অস্ট্রেলিয়ার একজন। দৈনিক পত্রিকার মধ্যে হিন্দুস্থান টাইমস হল বিড়লা গ্রুপের। 'দি হিন্দু' হল সুইস জেসুয়া সোসাইটির। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস হল ক্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রির। এশিয়ান এজ হল সৌদি আরবের এক ব্যবসায়ীর।

মুম্বাই কান্ডের পর টিভি চ্যানেলগুলোকে দেখা গেল রাজনৈতিক নেতাদের মুন্ডুপাত করতে লেগেছে। যেন হঠাৎ এদের কথা মনে পড়ে গেছে। অথচ এমনি সময় দেখা যায় এরাই ওই রাজনৈতিক নেতাদের ছবি জনমনে গেঁথে দেবার জন্য অবিরাম তাদের খবর প্রচার করে চলেছে। যাদের মধ্যে অনেক দাগী আসামীও আছে। দাগী বলেই হয়তো খবর হচ্ছে তারা। কিন্তু এই সুযোগে তার প্রচারটাও হয়ে যাচ্ছে। কারণ সব দাগী রাজনৈতিক নেতাদেরই একটাই অজুহাত যে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি তিনি নিরপরাধ। তা সে খুন-জোচ্চুরি যে মামলাতেই আসামী হোন তিনি। আর সবাই জানে আমাদের দেশে পয়সা খরচ করতে পারলে মামলা সারা জীবন ঝুলিয়ে রাখা শক্ত নয়। মিডিয়া চাইলেই এই ধরনের রাজনৈতিক নেতাদের বর্জন করতে পারে। কিন্তু করে না, বা করা যায় না। কেন করা যায় না সে রহস্য বোঝার জন্য শার্লক হোমস হবার দরকার হয় না। আসলে ব্যবসা আর রাজনীতি সব একাকার এখন। র.চ.

এগার

কে কয় আমাগো ভারত গরীব

বিশিষ্ট চোরেরা চুরির টাকা সুইস ব্যাঙ্কে জমা করে সবাই জানে। শুধু ভারত নয়, সব দেশের চোরেরাই তাই করে। এরা এলেবেলে চোর না। স্ব স্ব দেশে বিশিষ্ট ব্যক্তি এরা। কেউ নেতা, মন্ত্রী বা তাদের আপনজন। কেউ সরকারি আমলা বা তাদের আশ্রয়পুষ্ট এজেন্ট। কেউ ফিল্ম-স্টার কিংবা তাদের মেনটর ডন। কেউ ব্যবসাদার কিংবা দেশ-গৌরব ইনডাস্ট্রিয়ালিষ্ট। এনারা চারদিক আলোকিত করে ঘুরে বেড়ান দেশে এবং বিদেশে। এদের অনেকেরই ছবি ও মুখ নি:সৃত বাণী টিভি মারফৎ প্রচারিত হয়। আমরা শুনি এবং দেখি।

ভারতের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ গৌরবের অধিকারী আজ। চুরির টাকা জমাকারী হিসেবে পৃথিবীর সব দেশকে বহু পিছনে ফেলে দিয়েছে এরা। সুইস ব্যাঙ্কে এদের জমানো অর্থের পরিমাণ অকল্পনীয় স্তরে পৌঁছেছে। ডলারের হিসেবে তার পরিমাণ ১,৪৫৬,০০০,০০০,০০০ ডলার!! লক্ষ-কোটির চেনা অঙ্কে বলতে গেলে ১.৪৫৬ লক্ষ কোটি ডলার! এর পরেই দৌড়ে অনেক পেছিয়ে রয়েছে রাশিয়া। -জমার অঙ্ক মাত্র এর তিন ভাগের এক ভাগ।

ভারতীয় চোরেদের জমানো টাকার অঙ্কটা কত বড় বোঝানর জন্য কিছু উপমা দিতে হয়। ধরা যাক এই টাকাটা আমাদের দেশের গরীব মানুষদের মধ্যে বিলি করার বন্দোবস্ত করা হল। তাদের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে ঠিক হল। তাহলেও ৪৫ কোটি লোককে দেওয়া যাবে এই টাকা! আরেকটি দৃষ্টান্ত। আমারা আমাদের বিদেশি ঋণের বোঝা নিয়ে অনেক দুর্ভাবনার কথা বলি। কিন্তু এই টাকাটা উদ্ধার করতে পারলে এক লহমায় সব ঋণ শোধ করে ফেলা যায়। সুইস ব্যাঙ্কের ভারতীয়দের জমানো টাকাটা আমাদের মোট বিদেশী ঋণের পরিমাণের ১৩ গুণ। অর্থাৎ এই টাকাটা ফিরিয়ে আনতে পারলে সমস্ত বিদেশী ঋণ শোধ করার পরেও ঋণের বারো গুণ টাকা হাতে থাকবে। সেই টাকাটা যদি ব্যাঙ্কে ফেলে রাখা যায় তার সুদের পরিমাণ হবে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় বাজেট অঙ্কের থেকে বেশি! শুধু সুদের পরিমাণই এই। তাহলে টাকার পরিমাণটা কেমন, ভাবুন! এই টাকা যারা আত্মসাৎ করছে তারা দু'ভাবে দেশের সর্বনাশ করছে। চুরি করে এক দফায় করেছে। সেই টাকা বিদেশে পাচার করে আরেক দফা। এদেশের টাকায় বিদেশের পুষ্টি হচ্ছে।

এদেশ থেকে সুইজারল্যান্ডে যাতায়াতকারী লোকের সংখ্যা বছরে ৮০ হাজার। এর মধ্যে ঘন ঘন যাতায়াতকারীর সংখ্যা হল ২৫ হাজার! এদেরই এক অংশের যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করতে হাজার হাজার চাষীর জমি কেড়ে নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে এরোপোলিস স্থাপনের প্রতিযোগিতা চলছে। সেই পোলিসের একটি এই রাজ্যেও বসতে চলেছে। এত ঘন ঘন সুইস দেশে যাতায়াত করেন যারা তারা নিশ্চয়ই নিছক হাওয়া বদল করতে কিংবা সাইট-সিইং করতে যান না? ভারত সরকার চাইলেই সুইস ব্যঙ্কের অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের নাম-ধাম ঠিকুজি-কুষ্ঠী উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু করে না। কি করে করবে? 'ভারত সরকার' মানে কারা? কারা আবার, সেই 'বিশিষ্টজনদেরই' কেউ কেউ তো। নয় কি?

র.চ.

- ডাঃ বিনায়ক সেন -

শ্যামলী খাস্তগীর

আত্মীয়-সম প্রিয়জন সম্বন্ধে বলা সবচেয়ে কঠিন। ডাঃ বিনায়ক সেন আত্মীয় বন্ধু মহলে রাণা বলেই পরিচিত। আজ কতদিন হয়ে গেল জেলখানায় বন্দী। তার একমাত্র কারণ বোধ হয় সে কেন আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মত গাড়ি-বাড়ি-কেরিয়ার গোছাতে ব্যস্ত নয়। ডাক্তার হওয়া সত্তেও গাদাগাদা টাকার পেছনে না ছুটে সে আদিবাসী ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের সেবায় ও সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর।

জেলখানায় বিনায়কের সান্নিধ্যে যে সব কয়েদিরা এসেছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই জীবনের দিশা পাল্টে যেতে বাধ্য। তাঁর শান্ত হাসিমুখ ও কথাবার্তা, যে কোন মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করবে- এ আমার বিশ্বাস।

আমি যখন ৮০'র দশকের গোড়ায় বহুকাল পরে দেশে ফিরলাম, দীর্ঘকাল পারমাণবিক উন্মাদনা, যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসার প্রতিবাদ ও তাকে আরও গভীরে বুঝবার ফলস্বরূপ মনে হয়েছিল ভারতবর্ষ ও অন্যান্য গরীব দেশের মানুষ, যারা প্রকৃতির ছন্দ সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি, হয়তো বা নেহাত বাধ্য হয়েই ফসল ফলিয়ে নিজেরা আধপেটা খেয়ে শহরকেও অন্ন যোগায়, তাদের কাছে অনেক শেখার আছে। তারাই হয়তো এই সুন্দর বসুন্ধরাকে বাঁচার পথ প্রদর্শন করতে পারবে। সেই ভাবনা নিয়েই আমার দেশে ফেরা ও দেশে যে সব মানুষ স্বাবলম্বন ও সেবার কাজে সমাজ পরিবর্ত্তনের জন্য গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত, এরকম বহুজনের সঙ্গে পরিচয় হয় ক্রমশই। মনে আছে ১৯৮২ কি ১৯৮৩ সালের মাঘোৎসবে ব্রাহ্মসমাজে যুব উৎসবের দিন এক আলোচনা সভায় ক্ষোভের সঙ্গেই কিছু বলেছিলাম। যাঁরা কত ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, সমাজ পরিবর্ত্তনের আশায়। সব ধর্মরে মানুষকে ভাবের আদান প্রদান, শিক্ষা ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শক ছিলেন। আজও দেশে ও সারা পৃথিবীতে যে কত সমস্যা, তার জন্য কেন ব্রাহ্মসমাজের যুব সম্প্রদায় নীরব? শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন পূর্বপরিচিত ছিলেন। হঠাৎ এক মহিলা ভিড় ঠেলে এসে ধীর কণ্ঠে বললেন, "আমার বড় ছেলে রাণা যা করছে, তা তোমার ভাল লাগবে। ও এলে খবর দেব।" তার কিছুদিন বাদে একটা পোষ্টকার্ড এলো, রাণা বা বিনায়কের কাছ থেকে যে, ও কলকাতায় এসেছে। আমি ওর চিঠি পেয়েই কলকাতায় ওর ভাই মনার ফ্লাট বাড়িতে হাজির হলাম। ওর বাবা ডাঃ দেবপ্রসাদ সেন এবং মা অনুসূয়া সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় লখনউ তে। তবে শান্তিনিকেতন ও ব্রাহ্মসমাজ সূত্রে কয়েক পুরুষ ধরেই পারিবারিক যোগসূত্র। বিনায়কের বড় পিসি, অর্থাৎ দেবুদার বোন অমিতা সেন (খুকু) ছিলেন রবীন্দ্র স্নেহধন্যা গায়িকা। এঁদের পরিবারের সবাই একত্রে গান গেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেন। সেই সন্ধ্যাটিও কাটল বহু ব্রাহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে। তারই ফাঁকে ফাঁকে ছত্তিশগড়ে ওরা শ্রমিকদের সাহায্যে যে হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন, খাদান কর্মীদের দুঃখ দুর্দশার কথা ও অন্যান্য ডাক্তাররা, যারা ওষুধ কোম্পানী ও নানা দুর্নীতির সঙ্গে মোকাবিলা করে সাধারণ মানুষের সেবায় কাজ করছেন। মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কেলের এক মহিলা কর্মীও এসেছিলেন, কেরালা থেকে বিনায়কের সঙ্গে তাঁদের পত্রিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করতে। একবেলার জন্য গিয়ে প্রায় দু'দিন কাটিয়ে মনটা ভরে গেল। এঁদের কাজের কথা তো খবরের কাগজে বা পত্রপত্রিকায় বের হয়না, কাজেই জানাও যায় না তেমন। এর বেশ কিছুদিন পরে দেবুদা-রা পূজার ছুটিতে ছত্তিশগড় যাওয়া ঠিক করলেন। আমার জন্যও টিকিট কাটবেন বলে জানালেন। ততদিনে শ্রমিক হাসপাতাল তৈরী হয়ে হেছে- চিকিৎসার কাজও শুরু হয়েছে। ডাঃ আশিষ কুন্ডু, ডাঃ চঞ্চলা সমাজদার ও ডাঃ শৈবাল জানা মনে হয় আগেই ছিলেন। ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ-ও যোগ দিয়েছেন। বিনায়ক তখন দল্লি রাজহড়ার এক পরিত্যক্ত আবাসনে

স্ত্রী ইলিনা ও ছোট্ট মেয়ে প্রাণহিতাকে নিয়ে থাকছিল। জল থাকলেও বিজলি বাতি ছিল না। তার মধ্যেই ক'দিন আনন্দে কাটল। এত রকমের বই! কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়ি? পৃথিবীর সব রকমের সমাজ পরিবর্ত্তনের ভাবনা, যন্ত্র সভ্যতার ভয়াবহতা, কারিগরদের সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা, ক্রাফট গিল্ড, ইত্যাদি যে সব চিন্তাভাবনার কথা সচরাচর জানা যায় না, এমন সব মানুষের জীবনী ও অজানা কত ভাবনা-চিন্তা ও সমাজ পরিবর্ত্তনের ভাবনার কত বই - এছাড়া ইলিনার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে রাণা বা বিনায়ককেও যেন ভালভাবে চিনতে পারলাম।

তারপর কতকাল কেটে গেছে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সূত্রপাত, পোখরানের প্রতিবাদ, শঙ্কর গুহ-নিয়োগীর হত্যা, ইত্যাদি নানান প্রতিবাদ সভায় ওদের সঙ্গলাভ হয়েছে, তারাও কয়েকবার এসেছে। কিন্তু এরকম অহিংস শান্ত স্বভাবের গঠনমূলক দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন এক ডাক্তারকে কীভাবে বন্দী করা সম্ভব? আমরা বাঙালি সমাজ - ব্রাহ্ম সমাজ সবাই চুপ করে আছি। নিজেরই ভাবলে লজ্জা হয়। ডাক্তারের কাছে সব রকমের রুগীরা আসবে। কে কেমন তা বিচার না করেই ডাক্তারের কর্তব্য রুগীর চিকিৎসা করা। সে তো সেই কাজই করেছে। আমি প্রায়ই প্রশ্ন করে থাকি যে, আইনজীবিরা জেনেশুনে টাকার জন্য বধূ-হত্যাকারী ও অন্যান্য অন্যায়কারীদের আদালতে ছাড়িয়ে আনেন, কারণ বাছবিচার না করেই তাদের মক্কেলদের জিতিয়ে দেওয়ার জন্য কেস লড়াটাই নাকি তাদের কর্তব্য। আমি শিক্ষিত সভ্য সমাজের নিয়ম-কানুন, ন্যায় -অন্যায়, উচিত-অনুচিত, কিছুই বুঝি না। আপাতত এইটুকুই প্রার্থনা বিনায়কের স্বাস্থ যেন ঠিক থাকে, মনের জোর ও হাসিমুখে গান গেয়ে চলার শক্তি যেন ওর চিরকাল থাকে।

আত্মশক্তির জয় হবেই হবে। বিনায়কের মত আরও অনেকে সমাজের কাজে আসবে নাকি?

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরেজি
প্রকাশনার স্থান	:	পি-২৫২ লেক টাউন ব্লক-এ কলকাতা ৭০০ ০৮৯
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ ৯২ এ. পি. সি. রোড কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	:	ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে অলকা প্রিন্টার্স কলকাতা ৭০০ ০০৯

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে, উপরি-উক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ রবীন মজুমদার
প্রকাশক, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

অশোকদাকে প্রনাম করা হয়নি

প্রদীপ দত্ত

১৯৮০ সালের মধ্যেই আমার যা সামান্য লেখাপড়া তা শেষ। চাকরি করতে জাহাজ কিম্বা দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। চাকরির কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। আমার বয়সী যারা চাকরি-বাকরিতে ঢুকেছে তাদের তখন করুণা করি। নতুন করে কিছু সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। এইসব অপরিণামদর্শিতার উদাহরন তখন অনেক ছিল। আমার মতো এখনকার সময়ে প্রায় পরিচয়হীনদের অনেকেরই ঐ ছিল পরিচয়।

কিছুদিন ধরে অপূর্বদের (ইষ্ট ক্যালকাটা সোসিওকালচারাল অ্যাসোসিয়েশন) সঙ্গে কাজ করছি। একই ধরনের কাজে যুক্ত মেজদা, খোকনদার সাথে আলাপ হল। যোগিনদা সবে কলকাতায় আবার এসেছেন। বললেন, 'উৎস মানুষ'নামে একটা পত্রিকা বেরোয়, দেখেছো? অশোককে চেনো? শুনলাম কাজের লোকের অভাবে নাকি পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। খোঁজ খবর করে কয়েকটি সংখ্যা জোগাড় করলাম, পড়ে মুগ্ধ হলাম।

এরই মধ্যে রাজনৈতিক কাজে নিজেকে অযোগ্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। নানা সামাজিক আন্দোলনের কাজেও মনের তেমন সাড়া নেই। এমন সময় একাশি সালে 'উৎস মানুষ' দেখে মনে হল যেন-এই তো চেয়েছিলাম। ততদিনে আমি কেষ্টপুরের বাসিন্দা। বাস ধরে সল্টলেকে ফুটব্রীজে নেমে চার নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক। সাদা পা'বি-গেঁ পরা সুদর্শন যুবক অশোক বন্দোপাধ্যায়কে পছন্দ হল। অনেকটাই রাবীন্দ্রিক চেহারা। তখনো পর্যন্ত অমন সুদর্শন, সুভাষিত কোনো বন্ধু-দাদা আমার ছিল না। বাড়ির ছোট, অবিবাহিত ছেলে। কয়েক ঘন্টা কথা হল। তারপর উৎস মানুষ-এর কাজে যাকে বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

নিবারণদার হত-দরিদ্র বাইন্ডিংখানা ছিল আমাদের রোজকার বসার জায়গা। সেখানে বউদির সঙ্গে নিবারণদার ঝগড়ায় আমরা সবসময় বউদির পক্ষ নিতাম। অতটুকু ঘরে সাত আট জনের বসার জায়গাই হয়না, তারপর ঐ ঝগড়ার সুবাদে কাজকর্ম লাটে ওঠার জোগার। বেকায়দায় পড়ে অশোকদা তাকে ধমকাতেন। ড. অশোক বন্দোপাধ্যায় আর পবন মুখোধ্যায়ের প্রতি তার আশ্চর্য সমীহ ছিল। নিবারণদা কেমন ঠান্ডা মেরে যেতেন। বাইন্ডিংখানা থেকে রোজ এক সাথেই ফিরতাম। ট্রেনে উল্টোডাঙা স্টেশনে নেমে যে যার বাড়ি। ভাস্করদা কখনো একসাথে, কখনো আলাদা। পবনদা দক্ষিণের ট্রেন ধরতেন। সপ্তাহে একদিন করে থাকতেন দিদিভাই-পূরবী ঘোষ।

রাস্তায় বেড়িয়ে খাই-খাই বাইটা অশোকদাই ধরিয়েছিলেন। তেলেবাজা, স্টেশনের শশা, ঝালমুড়ি যা পাই তাই খাই। অবশ্যই অশোকদার পয়সায়। আমি তখন রোজগারই করিনা। ক্রনিক আমাশার কথাও বলতেন, সেই ভয়ে খাওয়া বন্ধ করতেন না। উৎস মানুষ ততদিনে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। নানা জায়গা থেকে ডাক আসতো। অশোকদা যেতেন, আমরাও কেউ কেউ যেতাম। খেতে খেতে যেতাম, গিয়ে খেতাম, খেতে খেতে ফিরতাম। বছর দশেক আগে বাজপেয়ীর আমলে যখন পরীক্ষামূলক পরমানু বিস্ফোরণ ঘটলো, আমরা প্রতিবাদীরা বেশ কিছুদিনের জন্য ১৮নম্বর সূর্য সেন স্ট্রিটে এক কাট্টা হয়েছিলাম। অশোকদাও আসতেন। কয়েকদিন হাতিবাগান হয়ে উল্টোডাঙা পর্যন্ত একসাথে ফিরেছি। হাতিবাগানের দুশ গজ আগে ট্রাম থেকে নেমে আমরা তেলেভাজা খেতাম। এখন মনে হয় এইসব অনিয়ম না করলে অশোকদা হয়তো আরো কয়েক বছর বেশি বাঁচতেন। রাগ এবং আনন্দ দুয়েরই অভিব্যক্তি ছিল একটা প্রচলিত জোরালো গাল। পরে দেখেছি অনেকেরই ভালো না লাগলেও কম বয়সীরা তাতে মুগ্ধ হয়। ভাবে ফিজিক্সের পি এইচ ডি, এত ভালো কাজকর্মের হোতা, কত সহজ ভাবে মেশে! গুরু, একেবারে গুরুদেব! অমন সুন্দর

চেহারা, সুন্দর মুখ, সুললিত কণ্ঠস্বর, সর্বপরি উৎস মানুষ-এর কর্মকান্ডের প্রাণ পুরুষকে অবজ্ঞা করে সাধ্য কার!

১৯৮৩ সালের মধ্যেই উৎস মানুষকে ঘিরে বৃহত্তর কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলাসহ আসাম, ত্রিপুরাতে তুমুল উৎসাহ দেখা দিল। ততদিনে উৎস মানুষ-এর টিম বড় হয়ে গেছে। পবনদা, ভাস্করদা, শ্যামল দানা, শ্যামল ভদ্র, চিত্ত সামন্ত আর আমি ছাড়াও মধুসূদন দত্ত, স্মরজিৎ জানা, পূরবী ঘোষ -অনেকেই সময় দিচ্ছেন। লাজিদি (অশোকদা নাম দিয়েছিলেন লিজা), রিক্তাদিরা আসার আগেই চলে এসেছেন পারুলদি। তারপর জ্যোতি, গুটু, কিছু পরে তরুন, বরুনদা, বইমেলার সময় শ্যামাদা এবং আরো অনেকে সামিল হয়েছিলেন। এই অবস্থার মধ্যেই মতের মিল না হওয়ায় উৎস মানুষ সঙ্গ একেবারে ছেড়ে দিলাম।

ব্যাপারটা অবশ্য সহজ ছিলনা। দু:খবোধ ছিল তীব্র। ততদিনে উৎস মানুষের বিশেষ বন্যা সংখ্যা, জ্যোতিষ সংখ্যা বেরিয়ে গেছে, বেরিয়েছে কয়েকটি সংকলন। বইমেলার স্টল চালু হয়েছে, কাজে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে, নানা ঘটনার সরেজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রকাশ শুরু হয়েছে। নানা জায়গায় উৎস মানুষ পাঠক সভা চালু হয়েছে। সম্পাদক মন্ডলী পত্রিকা চালায়। পশ্চিমবঙ্গে গণবিজ্ঞান আন্দোলনও শুরু হয়েছে। (এই উৎসাহ আর আয়োজন দেখে সিপিআইএম কিছুদিন পরে বিজ্ঞান ম' তৈরি করে। পার্টি রয়েছে বলে বিজ্ঞান ম'ও রয়েছে, অথচ বিজ্ঞান আন্দোলনের যুগ প্রায় শেষ)। আমরা তখন নারী মুক্তি ও কতৃত্ববাদ নিয়েও চর্চা করি, ঝগড়া করি। স্বপ্ন দেখি, আলোচনা করি -গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ছাপাখানা খুলবো। প্রথমে চাকরি নেবো ভাস্করদা আর আমি। পরে অশোকদা চাকরি ছাড়বে। কথার কথা নয়, আন্তরিক ভাবেই ভাবতাম। ভাস্করদা তখন উৎস মানুষ থেকে সামান্য মাসোহারা পেতেন। আট জন চাকুরিজীবি চাদা তুলে আমাকে আশি টাকা করে দেন।কথা চলছিলো উৎস মানুষ এবং প্রকাশিতব্য নতুন পত্রিকা অন্বেষার পক্ষ থেকে আমাকে তিনশ করে ছশ টাকা দেওয়া হবে। দুয়েরই হোলটাইমার হবো। চাকরি করতে হরেনা। এই অবস্থায় উৎস মানুষ থেকে দূরে সরে থাকা জটিল মানসিক সংকটের জন্ম দেয়। ততদিনে কেরানির চাকরিতে ঢুকে গেছি। তবে চাকরি ছিলো বাড়তি জ্বালা।

এরমধ্যেই অশোকদা মিত্রাদির বিয়েতে খেয়ে এসেছি। কয়েক বছর পর নানা কাজে একটু ধাতস্থ হলে, উৎস মানুষে পরমানু বিদ্যুৎ ও অন্যান্য প্রসঙ্গে লিখতাম। আগে লিখেছি কখনো কিন্তু বেনামে।মূলত প্রতিবেদন। পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনে তখন উৎস মানুষকে বাদ কিছু করার উপায় ছিল না। ১৯৮৯ সাল থেকে সেফ এনার্জি অ্যান্ড এনভায়র্রনমেন্ট -এর কাজে পুরোপুরি যুক্ত হয়ে অশোকদাদের সাথে যোগাযোগ একেবারে বন্ধ হয়। পাঁচ - ছ বছর ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত চালাতে দম বেরিয়ে যাবার জোগাড়। ১৯৯৫ সালে পত্রিকাটি বন্ধ করে মনের এমন অবস্থা হলো যে কারো সঙ্গেই যোগাযোগ নেই। ১৯৯৮ সালে বিজেপি সরকার পর পর পাঁচটি পরীক্ষামূলক পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটালো। আমি তার খোঁজ রাখিনা। টিভি দেখিনা,খবরের কাগজ পড়িনা। একদিন দুপুরে অশোকদা অফিসে টেলিফোন করলেন। এ নিয়ে উৎস মানুষে লিখতে হবে। যত বলি, বেশ ক'বছর লিখিনি। সব আমি ভুলে গেছি, পারবো না। ভাবেন অভিমান। অভিমান নয় বোঝাতেই যাহোক কিছু লিখতে হলো। তারপর সেই ১৮ সূর্য সেন স্ট্রিটে কিছুদিন নিয়মিত দেখাসাক্ষাতের কথা আগেই বলেছি। পরবর্তী কয়েক বছরে কয়েক বার বাড়ি বদল করে, অনেকের মতো অশোকদার সঙ্গেও আবার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। শেষ দেখেছিলাম ভাস্করদার বাবা ড. গোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায়ের স্মরণ সভায়।

কিছুদিন আগে পুণ্য জানালো, তোমার এক সময়ের গুরু এখন হাসপাতালে। তার কিছুদিন আগে আমার দাদাও বলেছিলেন, অশোকদার শরীর খারাপ। এরপর ভাস্করদা-রেখা খবর দিলো অশোকদা বি এম বিড়লায় ভর্ত্তি হয়েছেন। 'শরীর খারাপ' কথাটা আগে এতবার শুনেছি অশোকদার ব্যাপারে যে আমার কাছে সে কথার

গুরুত্ব কমেছিলো। কী করে যে ধারণা হয়েছিল অশোকদার ইস্কিমিয়া হয়েছে, মাঝেমাঝে শরীর খারাপ হবে। বি এম বিড়লা নামটা শুনে অসুখের গুরুত্ব বুঝলাম। হাসপাতালে গিয়ে গুনি জ্ঞান নেই। ভেন্টিলেটার চলছে। রোগটার নাম 'কার্ডিও মায়োপ্যাথি'।রোগের বিবরণ শুনে অনুশোচনা হলো, এ কয় বছর এত শারীরিক কষ্টের সময় কাছে গিয়ে হাসি মুখে দাঁড়াতে পারিনি বলে। বি এম বিড়লা থেকে বদলি করা হলো সি এম আর আই-তে। চোখে দেখলাম মৃত্যুর পর। রাত দশটার পর যখন সি এম আর আই-এর মর্গ থেকে মৃতদেহ বার করা হলো। একটু বেশিই তরতাজা লাগলো। বহু টাকা খরচের পর প্রাণ ফিরে না পেলেও এটুকুই হয়তো শান্তনা ছিলো। যেন স্বাস্থ্যবান বীরপুরুষ। অবশ্য যুক্তিতে ক্ষুরধার ও হাসিতে অসামান্য অশোকদার চেহারা তা ছিলো না। অনেকদিন পরে দেখলাম, কিন্তু প্রাণ নেই। ফুলমালা দিয়ে সাজানো হলো। মিত্রাদি আশ্চর্য শান্ত। পাশে ছিল মিস্টি। ওদের মেয়ে।

শববাহী গাড়ি চলতে শুরু করলে ভাস্করদা বললেন, পকাইবাবু নমস্কার করো। হাত জোড় করে মাথায় বুকে ঠেকিয়ে দুজনেই নমস্কার করলাম। পরে মনে হলো মস্ত ভুল হলো। আজকাল তো কত লোককেই পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করি অথচ অশোকদাকে প্রনাম করা হলো না।

AIMBEE

36/1/1 Tangra Road, Kolkata 700 015, Ph : 2329 3757

Service for

- Pest control
- Dusting & Cleaning
- Book Preservation
- Extermination of White Ant Treatment
- Termite Control
- General Order Supply

References:

Calcutta University (Departments, Libraries, Laboratories, Accounts Office, etc.)
Colleges (Libraries & Laboratories)
Banks
Central & State Government Offices

Space Donated by

A WELL WISHER

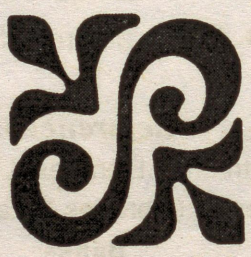

শ্রী অচ্যুতানন্দ দাস স্মরণে

বি ও বির এই সংখ্যা ছাপানোর ঠিক মুখে নীলাকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো এক দুঃসংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। জনস্বার্থের সংগ্রামে আজীবন নিবেদিত প্রাণ এবং বি ও বি'র বৃহত্তর পরিবারের সদস্য আমাদের পরম প্রিয় ও পরম শ্রদ্ধার প্রাত্র **'দাসদা'** (শ্রী অচ্যুতানন্দ দাস) গত ২৬ শে জানুয়ারী, ২০০৯ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা তাঁর অগণিত শুভানুধ্যায়িরা এই মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শোকস্তব্ধ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর পরিবারের প্রতি আমাদের সার্বিক মঙ্গল কামনা রইল। তাঁদের শোক ও দঃখে আমরাও সমান অংশীদার।

Vigyan O Vigyankarmi Rs. 20.00 Vol. XXIX & XXX No. 1-8
Rn. No. 34929/79 January 2007 - December 2008

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের
পক্ষে অলকা প্রিন্টার্স, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলি - ৯ থেকে মুদ্রিত।